এরিণা

ঝিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংল্যান্ডের আকাশ এই ফাগুনমাসে কেমন হয়? দূরে নীলাভ আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছিল অবিনাশ। একটু আগে সম্ভবতঃ জেট প্লেন চলে যাওয়ায় আকাশে টানা শাদা দাগ। ডাব গাছের পাতাগুলি হাওয়ায় মাথা নাড়ছে। চারিদিকে উজ্জ্বল রোদের আমেজ। দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছের ফাঁকে দেখা যায় 'দি গ্রেট রোমান সার্কাসের' খুঁটি মানে মাথার চূড়োটা। মফঃস্বল শহরে জমিয়ে বসেছে দি গ্রেট রোমান সার্কাস। ভাবতেই গোকুলবাবুর কথা মনে পড়ল অবিনাশের। গোকুল, মানে গোকুলবাবু সার্কাসের জোকার। সম্প্রতি তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে অবিনাশের। সার্কাসের মালিকের সঙ্গেও। ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে সার্কাস দেখতে আসার দিনটা মনে পড়ল অবিনাশের। সে এই মফঃস্বল শহরের বিখ্যাত কলেজটির অধ্যাপক, এদিকে ওদিকে লেখে টেখে, সার্কাস নিয়ে উপন্যাস লিখবে শুনে সার্কাসের মালিক খুব খুশী। কলকাতার বড় বাড়ির ছেলে বলে মালিকের গর্ব আছে। মালিক চট্রস্পপ্ল পাশ। 'মেরা নাম জোকার' দেখেছে অনেকবার। হাঁটতে হাঁটতে এইসব ভাবতে ভাবতে এইখানটায় হেসে ফেলল অবিনাশ। মালিকের নাম প্রতাপ নারায়ণ হাজরা, লম্বা, রোগা, গলার এ্যাডমস এ্যাপলটা বড়, কথা বললে ওঠা নামা করে।

মালিক বলছিল, 'আমরা বৌবাজারের হাজরাবাড়ির হাজরা, বিরাট রঙের ব্যবসা ছিল আমাদের, চট্রস্পপ্ল পাশ করার পর ভালো ভালো ব্যবসা করতে পারতাম স্যার, কিন্তু ঐ মেরা নাম জোকার দেখার পর থেকে মনে হল সার্কাসের ব্যবসা করলে কেমন হয়? কত কষ্ট করেছি, টাকাও ঢেলেছি বিস্তর। এমন সার্কাস বাংলায় নেই স্যার। ভেবেছিলাম নাম দেব 'বাঙালীর সার্কাস', তারপর পরামর্শ করতে গেলাম আমাদের কলেজের ইতিহাসের স্যারের সঙ্গে। ইতিহাস স্যার অনেক বই লিখেছেন, ডকটরেট। তিনি ভেবে বললেন নাম দাও 'দি গ্রেট রোমান সার্কাস', তাই দিলাম। আপনি উপন্যাস লিখবেন সার্কাস নিয়ে তাই আপনাকে এত কথা বলছি স্যার। তারপর একটু ভেবে উত্তেজিত গর্বিত মুখে বলেছিল ঐ যে স্যার ফার্স্ট রাউন্ডে একটা খুব বেঁটে জোকার মাউথ অরগান বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় না? ঐটা কিন্তু আমার বাজানো, টেপ করা আছে। টেপটা চালিয়ে দেওয়া হয় আর গোপলা মানে ঐ বেঁটে জোকারটা মুখে মাউথ অরগান রেখে অভিনয় করে।'

অবিনাশ বিস্ময়ের মুখভঙ্গী করেছিল, 'আপনার বাজানো? বাঃ পাশে বসা ভিক্টোরিয়া বলেছিল 'সত্যিই খুব সুন্দর'। ভিক্টোরিয়ার সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে প্রতাপনারায়ণ হাজরা কন মুখে বলেছিল " আর দিদি, শিক্ষিত ছেলে, শুধু মাউথ অরগান বাজানো নয় আমি ভালো অভিনয় করতাম। এখন শুধু সার্কাস নিয়েই পড়ে আছি। অত বড়লোক ছিলাম আমরা, এখন তো পড়তি অবস্থা। ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটির বি.কম. পাশ সার্কাস চালাচ্ছে এমন কখনো দেখেছেন?" তার ভঙ্গী এবার মালিকের মতো ছিল না।

অবিনাশ ভিক্টোরিয়ার দিকে একবার চেয়ে বলেছিল, 'ওহো, আলাপ করিয়ে দিই নি, ইনি হলেন দর্শনা সেন, এনার ডাকনাম ভিক্টোরিয়া। আমরা ভিক্টোরিয়া দিদিমনি বলি।

প্রতাপ নারায়ণ একগাল হেসে বলেছিল, 'আমিও তাহলে ভিক্টোরিয়া দিদিমনি বলবো।'

আজ দুপুরের কলরবহীন রাস্তা পেরোতে পেরোতে অবিনাশ মাথা নাড়ল পুরনো কথা ভেবে। ভিক্টোরিয়া ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হয়েছিল। কারণ আগ্ বাড়িয়ে তার ডাক নাম বলার কি প্রয়োজন ছিল? তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে সে প্রশ্ন করেছিল অবিনাশকে,

--ডাক নামটা বলার কি খুব দরকার ছিল?
-- আসলে তোমার ডাক নামটা এত ভাল লাগে। পোশাকী নামের থেকেও এই নামটা বেশী সুন্দর।
অবিনাশের মনে হল ভিক্টোরিয়ার কথা ভাবছে বলেই সে কি দূর ইংল্যান্ডের আকাশের কথা ভাবছিল? ভিক্টোরিয়া আর ইংল্যান্ড তো ইতিহাসে বড় কাছাকাছি। না' কি ভিক্টোরিয়ার জন্য সে ইংল্যান্ড যায় নি একদিন এই কথা অবচেতনে খেলা করে তার। সে এখন ভিক্টোরিয়াদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল। ভেতর ভেতর খারাপ লাগছিল তার, পার্টি অফিসে গিয়ে প্রুফগুলো বিকেলের মধ্যে দেখে ফেলা উচিত ছিল, পরিমল কি ভাববে। দেখা হলে বলবে বুদ্ধিজীবি অধ্যাপকদের নিয়ে এই এক মুশকিল। অবিনাশদা আপনার নিজের মধ্যেই কালচারাল রেভলিউশন হয় নি। অধ্যাপক? ঐধ্যাপক? ম্লান হাসল অবিনাশ। সার্কাসের তাঁবু থেকে উঠে আসার আগে ভিক্টোরিয়া জিজ্ঞেস করেছিল প্রতাপ নারায়ণকে 'আপনি নিজে সার্কাসের নাম রাখলেন না কেন? স্যারকে জিজ্ঞেস করে রাখতে গেলেন কেন? সার্কাসতো আপনার'।
- না, না, স্যার বড় অধ্যাপক। কত বই লিখেছেন।
- আপনার ইতিহাসের স্যার যে 'দি গ্রেট রোমান সার্কাস' নাম রাখলেন কেন রাখলেন, এই সার্কাসের সঙ্গে তার মিল কোথায় এ'সব ভেবেছেন?
-- না দিদি, অত বই পড়া একটা লোক রাখতে বললেন, নামটা শোনাচ্ছে ভাল, তাই রাখলাম। তবে আমার দেওয়া নামটা মানে 'বাঙালীর সার্কাস' বা হাজরা'স সার্কাস রাখলেও চলতো।
-- ও, আচ্ছা। অবিনাশের মনে পড়ল ভিক্টোরিয়া এ'সময় তীব্র কটাক্ষ করেছিল তার দিকে। অবিনাশও ইতিহাস পড়ায়, ইতিহাসের অধ্যাপক। তার মনে পড়েছিল 'বোসে'স সার্কাস' বলে সম্পূর্ণভাবে বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত একটা সার্কাস ছিল একসময়, ইংরেজ আমলে। সেখানে বাঘের খেলা দেখাতেন সুশীলাসুন্দরী নামে একজন বাঙালী মেয়ে। প্রতাপনারায়ণ এখনও চা আসছে না কেন বলে উঠে গিয়েছিল।
ভিক্টোরিয়া অস্ফুটে মন্তব্য করেছিল, 'বইপড়া অধ্যাপকের ভাষা, লেখকের কল্পনা, কতদূর পৌঁছোয় কে জানে। আমিও তো একটা গোষ্ঠীর বাইরে মেলামেশা করিনা'। তারপর হঠাৎ স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গে ফিরে গিয়ে অবিনাশকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি ইতিহাস পড়ান না? তার ঠোঁট মুচড়ে হাসি এসেছিল। সেদিন সাদা রঙের ব্যবহার ছিল তার শরীরময়। শাদা খোলের শাড়ি, মুক্তোর দুল, মুক্তোর আঙটি, সাদা চটি, শাদা.....অবিনাশ তার ঝোলা ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখছিল বিঠোফেনের সিম্ফনির ক্যাসেটটা আছে কিনা। আজ ভিক্টোরিয়াকে সে এটা দেবে। ৮১ নম্বর বাড়ি। এইখানে এসে সে আবার পুরনো প্রেমের গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিল।
'তোমার পৃথিবীর পথ, নক্ষত্রের সাথে তুমি খেলিতেছ পাশা শঙ্খমালা নয় শুধু, অনুরাধা, রোহিনীরও চাও ভালবাসা' অবিনাশ ভাবল, তারপর এগিয়ে চলল ৮১ নম্বর বাড়ির দিকে।

কিন্তু না সেদিন ভিক্টোরিয়াদের বাড়ি বসা হয়নি তার। সে গিয়ে দেখেছিল আসর জাঁকিয়ে কথা বলছে শ্রী ভবতারণ নিয়োগী। বিখ্যাত স্যাকরা ও মানিকার। বয়স্ক লম্পট। ভিক্টোরিয়ার স্তাবকদের একজন সে। ভিক্টোরিয়া তাকে খেলায়। যেমন সাপকে খেলায় সাপুড়ে। তার কাছ থেকে নানা সুযোগ সুবিধে আদায় করে। মায়াবিনী রাণী আজুবার মতো হাতকাটা পোষাক পরে সে ঘুরে যায়। নিয়োগীও তাকে সাহায্য করার জন্য উলসে ওঠে। অস্তসূর্যের আলোয় আসা সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়ায় পথ ধরে সেদিন অবিনাশ মিত্র ফিরে গিয়েছিল বিঠোফেন নিয়ে। এর আগে সে ভিক্টোরিয়াকে দিয়েছিল মোৎসার্ট এর সিম্ফনি কিন্তু বিটোফেন দিতে পারেনি। এক বিস্তীর্ণ সার্কাসের এরিণা জেগে উঠেছিল, সেখানে ট্র্যাপিজের খেলা, কত রকম খেলোয়ান, কত আলো। ভিক্টোরিয়া তখন নিয়োগী আছে বলে তাকে একটু ঘুরে আসতে বলেছিল।
অবিনাশ টের পাচ্ছিল এক ধূ ধূ এরিনা জেগে উঠছে তার বুকের ভেতর। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে যে এরিনা বহুদূরে। সে একা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল নিজেরেই মুদ্রাদোষে। বিহারে তখন রনবীর সেনার গুলিতে লুটিয়ে পড়ছিল ভূমিহীন কৃষক। নিরীহ মানুষ গরীব মানুষের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছিল ভারতবর্ষের মাটি। বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে দাঙ্গা শু করা হয়েছিল।

এরিনায় ভিক্টোরিয়া সেন ঃ

আসলে তোমাকে ভালবাসতে পারি নি অবিনাশ, কিংবা কে জানে হয়তো বেসেছিলাম কিন্তু আমার প্রকাশভঙ্গী ছিল ভুল। এখন আর খুব বেশী ভাবি না এসব নিয়ে। আমি ঘুমুই পাশ ফিরে দু'হাত গালের নীচে দিয়ে। রাত্রে এখনও সুনিদ্রা হয় আমার, অথচ তোমাদের সঙ্গে দেখা হলে তোমরা বল তোমাদের ঘুম হয় না, ঘুম হয় না। আমার শুনে শুনে এখন অ ার কিছুই মনে হয় না। শ্যামনগরের একটা পুরনো স্কুলে পড়াতে যাই, টাকা রোজগার করি, টাকা উড়িয়ে দিই দু'হাতে। ছেলেদের দেওয়া উপহার নিয়ে নিই, বাছবিচার করি না। কাইকেই বেশীদিন দয়ামায়া' দেখাতে পারি না। স্টেশনারী দে াকানে ঢুকতে ভালোবাসি খুব। দামী, মসৃণ, উজ্জ্বল শৌখীন জিনিস ভালোবাসি খুব। টাকা, আহা কড়কড়ে টাকা দিয়ে কিনে বাড়ি নিয়ে আসি। ঐসব বিলাসদ্রব্য যোন আমাকে নিয়ে গুঞ্জরণ করে, সবসময় দি বেস্ট জিনিস পছন্দ আমার। তবে এ'ও জানি দি বেষ্ট এর পরে আরও দামী আরও দি বেষ্ট আছে পৃথিবাতে। আমি তাকেই খুঁজে অবিনাশ। আর সবাইকে সরিয়ে দিতে থকি। এই আমার খেলা। কাছে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবার খেলা। রনজয়কে বিয়ে করতে চাই কারণ ও 'দি বেষ্ট' ডাক্তার। ডাক্তারদের গাড়ি হয়। যতদিন রনজয় কাছে না আসে ততদিনই তোমাদের আয়ু অবিনাশ। তোমার মতো বোকা গুডবয়দের কথা ভেবে এত হাসি পায় আমার। তুমি আবার পার্টি করো। গরীবদের পার্টি। তোমার আর আমার জীবনদর্শন, কালচার এক নয় অবিনাশ। আর ঐ যে গানটা আছে না 'ভুল করো না ভালবাসায়'। কবে ছোটবেলায় ভালে াবেসেছিলে বলে এখনও নিজের জীবন জলাঞ্জলি দিতে হবে? তবে আমি তোমাকে এখনই তাড়াবো না অবিনাশ। সময় হলে তাড়াবো। তোমার কথা শুনতে ভালো লাগতো কিন্তু জানো তোমার সব কথা এখন ক্রমশঃ পুরনো হয়ে যাচ্ছে আম ায় কাছে। তোমায় জন্য কণাও হয়, মাঝে মাঝে তোমার কথা সামান্য ভাবি, নিজেকেই প্র করি 'কেন এ'সব করে ভিক্টো রিয়া?' আয়নার ভেতর থেকে ভিক্টোরিয়া সেন এই আমি, বলে ওঠে, রিভেঞ্জ, প্রতিশোধ! কার ওপর কি জন্য প্রতিশোধ কে জানে। ছোটবেলাটা খুব মানসিক কষ্টে কেটেছে আমার, এই জন্য কি? রবিবারে হঠাৎ অলকেশদের আমন্ত্রণে নাটক দেখতে চলে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে বাসে কথাগুলো ভাবছিলাম। ওদের ওখানেও জানতাম কেউ না কেউ প্রেমে পড়বে। আর আমি গুনে রাখবো এই ঊনত্রিশজন হল। ঠিক তাই ওদের ওখানেও পেছু নিল একটি ছেলে, কি মুগ্ধ সে অ ামায় দেখে। জানি এরপর ওর অবস্থা ঘোলা হয়ে যাবে আমার জন্য। আমার সৌন্দর্য না প্রেম প্রেম ভাব কোনটা দায়ী এ'জন্য কে জানে। অথচ অবিনাশ, তুমিই বল যে আমি নাকি খুব সুন্দরী নই, আমার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে এই মফঃস্বল শহরেও আছে। কেন তুমি আমায় সুন্দরী বলো না বলতো?

তুমি জানো না আমার দুঃখ কোথায়। রণজয় আমার একনম্বর প্রেমিক কিন্তু তার ছোটবেলা? যাক্ সে কথা থাক। তবু কেন যে সকলের সঙ্গে সম্পর্কের রেশ রাখতে চাই। তবু কেন যে তোমাকে ব্যাগ কিনে দেবার কথা ভাবি। ললিতমোহনের অফিসে বারবার টেলিফোন করি। ওর সঙ্গে আজও কথা বলি রনজয়কে লুকিয়ে। সুমে এলে চা করে দিই, দুধ না দিয়ে ক ারণ দুধ চায়ে ওর এ্যাসিডিটি হয়। অলকেশের আমন্ত্রণে সেই চুঁচুড়ায় নাটক দেখতে যাই। আবার রনজয় বিট্রে করছে জেনেও কলকাতায় বদমাইশ বুড়ো লোক ভরা বাসে চড়ে রনজয়কে সাহায্য করতে যাই। মনে আছে সে'দিনই দাঁত তুলেছি, যন্ত্রণা ছিল। শরীরে ব্যাথা ছিল। ঘুম ঘুম ভাব ছিল। ট্যাকসির পয়সা ছিল না। কোনো ছেলের সঙ্গে ট্যাকসি করে তো আর রনজয়ের মেডিক্যাল কলেজে পাওয়া যায় না। অথচ এরা তো সবাই আমার ছেলে বন্ধু, ঈর্ষা করো না অবিন াশ। মোমবাতির আলোয় তোমার সেই ছোট গুহাঘরে বসে থাকতাম না? তুমি আমার দু'চোখে ভালবাসা দেখতে পেতে না? তোমার রাগী বৌ এর চোখে তা পাও? সেদিন ভরা বর্ষায় ভিজে ভিজে গিয়ে দিল্লীর নীলাব্জকে ফোন করে জানলাম সে কেমন আছে। আশর্চ্য জানো ফোন করার সময় আমার গলায় স্বর অবিকল প্রেমিকাদের মতো হয়ে যাচ্ছিল। ফোন বুথের লোকটার অস্বস্তি হচ্ছিল আর আমার মজা বাড়াচ্ছিল। ওদিকে নীলাব্জ একেবারে পাগল। আমি কেন যে এ'সব করি তা আমিই জানি, আর তোমরা এজন্য আমাকে যে কি ভাবো তা'ও জানি। এতকিছুর মধ্যেও এক অদ্ভুদ একাকীত্ব ঘিরে রাখে আমায়। রণজয়ের সঙ্গে কি বিয়েটা হবে আমার? কে জানে। আর আশর্চ্য রনজয়ের পরেও হৃদয়ে কিছুটা জ ায়গা বোধহয় আমার ফাঁকা থেকে গেছে আর সেখানে ঢোকার জন্য তোমাদের ঠাসাঠাসি, মারামারি, মান, অভিমান।

আকাশ আজ চাঁদের আলোয় ভরে গেছে, তো কি হল তাতে? আমার নিশ্বাসের কষ্ট বেড়েছে আবার, কিন্তু তোমরা আম ার বাড়ি আসছো একের পর এক। এত ভালোবাসা নিয়ে কি করবো আমি। আজ মেঘের ভেতর যে অন্ধকার, যে বেদনা

জনে উঠেছে মনে মনে, তোমরা কি সেখানে পৌঁছাতে পার? আমি নিজেকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি তবু কখনও আমারও স্যাক্রিফাইস করতে ইচ্ছে করে। স্বপ্নের নত, অস্পষ্ট কত কল্পনার কথা মনে পড়ে, সেই ছোট বেলার কথা, প্যারিস বিমান বন্দরে আমাদের বিমান নেমেছিল মনে আছে। টিপটিপ বৃষ্টি, কুয়াশা, কাঁচের দরজা ঠেলে আমরা কোথায় কোথায় যেন গেলাম কোথায় যেতে পারে মানুষ? কতদূর?

কলেজ জীবনে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও তো আমরা কতদূর যেতে চেয়েছিলাম। মনে পড়ে হোস্টেলের করিডর ধরে রাম্ খেয়ে হাঁটছি আমি, পাশে নীতা, জিনসের প্যান্ট, ও শুধু ব্রা পরে হাঁটতে হাঁটতে ও আমাদের ঘরে ফিরছে। কি গাইছিলাম আমরা তা জানো?

ত্ত্রস্ত ব্ধপ্স ব্দ্রন্তঢ্রপ্প প্সু প্পন্ত ভ্রন্ত

ঢ ভ্রপ্সু'ব্ধ ন্ধ্রঞ্জ্বপ্স ন্দ্রপ্সক্স প্প্রুন্ত্র স্ত্রন্ত

ক্লিশে হয়ে যাওয়া এই গানটা গাইতে গাইতে নীতা জড়িত স্বরে বলেছিল,

---'শালা, ছেলেগুলো সব এক একটা খচ্চর' আমি চমকে উঠেছিলাম। নীতার মতো শিক্ষিত মেয়ের মুখে শালা ও খচ্চর শব্দটা যেন বড়ো কানে লাগে, যেন রিলকের পাশে বটতলার পর্ণোগ্রাফি। আর তা ছাড়া ছেলেদের সম্পর্কে আমি মোটেই তেমন ভাবি না। ওদের কথা, গদ্‌গদ্‌ভাবে মনে পড়লে মনে হয় এত বোকা ওরা। মূল কথার অনেকটা জুড়েই তো শরীর, তুমি আবার এতটা মানতে পার না। সেদিন ট্যাকসিতে তোমার আমাকে চুমু খেতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু তুমি কি করলে, ভয়ে ভয়ে হাতটা শুধু ধরলে আমার। কেন যে এত ভালোত্ব দেখাও অবিনাশ তুমি জানো না আমি সেরকম ধান্দাবাজ মেয়ে হলে তোমার কি হাল হতো। আসলে আমি আমার মতো করে তোমাদের কিছুদিন ভালো বাসতে গেছি আর তোমরা চেয়েছ তোমাদের মতো করে চিরকাল, এইখানেই সংঘর্ষ।

এরিনায় দর্শকের আসনে ঔপন্যাসিক ঃ

তো, ভিক্টোরিয়া সেনের প্রতিটা গল্পই এইরকম। উথাল পাথাল, সাইড্রাম বেজে উঠেছে যেন, শরীর আর ভোগবাসনা নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। রাজনীতি তাকে টানে নি কোনদিন। এরিনায় হাজার লোকের চীৎকার। আলো এসে পড়ছে তার ওপর, মঞ্চের বাইরে অন্ধকার। অন্ধকারের নিরাপত্তাহীনতা সে ভালো বাসে না। নৈশব্দ সে ভালো বাসে না। হৃদয়ের ব্যবহার করে করে সে ক্লান্ত, কিন্তু সে এরিনা ভালোবাসে, এরিণায় হল্লা, আলো চীৎকার তার পায়ের ঘূর্ণি........

অবিনাশ থাকতো না পেরে একদিন জিজ্ঞেস করে ফ্যালে,

---তুমি এত বেশী হৃদয়ের ব্যবহার কেন করো ভিক্টোরিয়া?

---জানি না।

--- তুমি জানো, তোমাকে না দেখলে আমার কষ্ট হয়। তোমার কষ্ট হয় না?

--- না; এক কাজ থাকে যে কিছু ভাবার অবকাশ থাকে না ভিক্টোরিয়া বলল।

---ছোটবেলা থেকে আমি তোমাকে এত ভালোবাসি...

---জানি স্যার, তোমার ভালোবাসা খুব গভীর।

---তুমি কি আমাকে ভালোবাসা না?

---কেন? আমাকে কি চেঁচিয়ে বলতে হবে ভালোবাসি, ভালোবাসি।

---কিন্তু আমি যে তোমাকে এক ভালোবাসি।

---তাতে কি আমার জীবন পাল্টাবে? ভিক্টোরিয়া কথা বলতে বলতে এবার উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। সে বেশ রুক্ষ স্বরে বলল, 'অবিনাশ, জীবনে একটা মেয়েকে কতটা ভালোবাসলে, তার প্রতি কতটা কর্তব্য করলে, কতখানি তাকে আগলে রাখলে এটা দেখেই যে মেয়েটি তোমার ভালোবাসায় পড়বে তা হয় না। না'ও পড়তে পারে সে। বড় জোর মেয়েটি তোমায় শ্রদ্ধা করতে পারে।'

অবিনাশ যেন ডুবে যেতে যেতে বললো, তাহলে কেমন ছেলেকে মেয়েরা ভালোবাসে?

-- যে কোন ছেলেকে, ধর তোমার মতো একেবারেই নয়, বরং বেশী দায়িত্বজ্ঞানহীন, দুর্বল, মীনমাইণ্ডেড ছেলেকেও

মেয়েটি ভালবাসতে পারে তোমার বদলে। তোমাকে বড় জোর মেয়েটি তার বিয়ের দিন বলতে পারে, 'যাও তো অবিনাশ, ম্যারেজ রেজিস্টারের বাড়ি যাও দেখতো উনি দেরী করছেন কেন? আর ফেরার সময় কয়েকটা ফিস ফ্রাই ভাজিয়ে নিয়ে এসো আলাদা করে। লোকজনকে আপ্যায়ন করো, দেখো কাজে ফাঁকি দিও না'। এ'কথা বলে মেয়েটি সুন্দর কে ামল চোখে তোমার দিকে বড়জোর তাকাতে পারে। এতে অবাক হবার কি আছে অবিনাশ?

অবিনাশ এর উত্তর দিতে পারল না। ভিক্টোরিয়াদের বসবার ঘরের সোফাটায় হাত বোলাতে লাগল মাথা নীচু করে। এই সোফা থেকে কত ছেলে তাদের অপূর্ণ বাসনা নিয়ে উঠে চলে গেছে।

অবিনাশ বললো, 'তুমি রবীন্দ্ররচনাবলীর অষ্টমখণ্ড চেয়েছিলে, এটা আমি তোমাকে দিলাম আর মোজার্টের এই সিম্ফনির ক্যাসেটটা'।

---থ্যাংক ইউ, রেখে দিচ্ছি। এটা আমার ছিল না।

অবিনাশ ভাবছিল সত্যিই তার ভেতর কালচারাল রেভলিউশন হয়নি। সে বিদ্রোহ করতে পারছিল না। তার সংস্কৃতি অ াঘাতের মুখে পড়েছিল। ি

ভক্টোরিয়া আর অপেক্ষা করতে চায়নি। সামন্তের দোকান ঘুরে তাকে নিয়োগীর কাছে যেতে হবে একবার নিজের দরক ারে। ঐ দুজন এত প্রা ট্টা করে না। ভীষণ খুশী হবে সে গেলে। এই মাস্টারটা এসে প্রশ্নের ঝুড়ি খুলে বসেছে যেন।

সে বললো, 'তোমার আর কিছু বলার নেই তো? আমি একটু বেবো'।

অবিনাশের নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল। তার মনে পড়েছিল স্ত্রীর কথা। সেখানেও সে ক্রমশঃ অবাঞ্ছিত হয়ে উঠছে বে াধহয় এখানে তার মনের জোর নেই, বিয়ের পরেও প্রেমে হাবুডুবু, অথচ আমি সেদিন বাঘা যতীনের কথা বল্লাম ছেলেদের। জুলিয়াস ফুচিকের কথা বল্লাম? অবিনাশ বোকার মতো ভাবল, মেয়েরা তবে কি চায়? সোফায় বসেই দেখল ভিক্টোরিয়া বেরিয়ে যাচ্ছে, একরাশ বিরক্তি মাখানো মুখে।

'মা আসছি' বলে সে গেট ঠেলে বেরিয়ে গেল।

আবার ভিক্টোরিয়া সেন ঃ

সেদিন কেমন বসিয়ে রেখে গেট ঠেলে বেরিয়ে গেলাম। মুখের যা একখানা অবস্থা হয়েছিল না। পরপর ক'দিন ভীষণ বৃষ্টি গেল তুমি এলে না অবিনাশ। তবে কি সত্যিই মায়া কাটাতে পারলে? আহা চুঃ চুঃ, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সুমে, মগাঙ্ক, অণেশ সববাই। কত চায়ের কাপের মধ্য দিয়ে বেড়ালাম আমরা, কতো সন্ধ্যাগহন সুপ্তিমগন আকাশে। বড্ড ন্যাকা রোমান্টিক তুমি তবু তোমার কথা আজ ভাবছি। তোমার কথার ভেতর ছবি থাকে আর ছবি দেখতে ভাল লাগে আমার। শিমুরালি কলেজে গিয়েছিলে একবার আমার জন্য গরমের দুপুরে formআনতে ফেরবার পথে কি দেখেছিলে, কল্যানীতে রোদে পোড়া মাঠ পেরোতে পেরোতে ১৪০০ বঙ্গাব্দের দুপুরে কি ভেবেছিলে, সবইতো বলেছ আমাকে। আর কি বলার আছে তোমার? আসলে বোধহয় মনটাই পাল্টে গেছে আমার। মনে হয় সব প্রদীপের নীচেই অন্ধকার থাকে। যারা আসে তাদের প্রায় সবায়ের মধ্যে 'ফিজিকাল লাষ্ট্' আছে। তোমারও আছে। তবে বুঝতে পারি আমাকে এত বেশী ভালবাস যে ভালোব াসার নীচে তোমার ব্যক্তিগত কামনা ঢাকা পড়ে যায়। মানে Sex, কে জানে ঠিক ভাবছি তো? আমারা মেয়েরা বয়ঃসন্ধিক্ষণ থেকে ভাবি ঐ পুষ আমাকে খেতে আসছে। অবশ্য এখন তো ঝিায়নের হাওয়া। মেয়েরা টিভি দেখে দেখে কেমন খোলা মেলা। ওরা চায় পুষের কামনা বাড়ুক ওদের দেখে? কে জানে, আমিও তো তাই চাই কিন্তু অন্যভাবে। এই খানটায় তুমি আমাকে ধরে ফেলেছো অবিনাশ। তুমি যেন গ্রাহাম গ্রীনের উপন্যাসের সেই নায়ক যে কোনটা কার উচিত আর কোনটা উচিত নয় তা ভাবতে ভাবতে শেষে একা হয়ে গেল সবাই ত্যাগ করলো তাকে। তোমারও এই নিয়তি অবিনাশ সেদিন তো দেখালে তোমাকে অগ্রাহ্য করলাম তোমার মাস্টারী ভালো লাগে নি বলে। যখন বেরিয়ে গেলাম তখনও কেমন বেচারার মতো বসেছিল সোফায়। যা হাসি পাচ্ছিল না।

আর রাস্তায় কিছুক্ষণ পরই অনেশের সঙ্গে দেখা। অকারণে খুব হেসে হেসে গল্প করলাম ওরসঙ্গে। অনেশ দু'বার আমার বুকের দিকে চোরা চোখে তাকাল আর কিছুতেই যায় না। শেষে গেলাম সেই 'ডেলিশাস্ রেস্তোরাঁয়' ..... কফি আর চিকেন কাটলেট খেতে খেতে ভাবছি সুমে এসে গেলে ভাল হয় ওর সঙ্গে বেশী করে কথা বলবো আর দুঃখিত অণেশ

কেটে যাবে। মুরগীর হাড়গুলো গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল আমার দাঁতের নীচে। অনেশ ইচ্ছে করে হাতে হাত ঠেকাল একবার এমন সময় সহসা রনজয়। ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম। রনজয়ের চোখ দেখে বুঝলাম রেগেছে বোধহয়। প্রেমিকা হাত ছাড়া হয়ে যাবার ভয় ভোগাচ্ছে ওকে। ঠিক যেন গেরস্তের ঘটি চুরি যাবার ভয়।

রনজয়কে আর কি বলি, তোমরা সবাই একরকম। রনজয়কে ডাকলাম, বসল, কফি খেল শুধু। অনেশের সঙ্গে কথাও বললো কিছু, কিন্তু তোমার সঙ্গে যেমন ওর জমেও তেমন জমল না। শেষে হি হি কি কণ দৃশ্য হলো শুনবে? শোনো, উপন্যাস লিখো টিখো কেমন, দাঁড়াও গুছিয়ে বলি।

আকাশে অল্প মেঘ। রনজয়ের থমথমে মুখ। তুমি হলে বলতে বিচ্ছেদ বেদনা জমে থমথম করছে'। রনজয়ের বাইকের পেছন উঠে বসলাম আমি, কাঁধ জড়ালাম ঈষৎ বুকটা ঠেকে গেল ওর পিঠে, যা হয় ও ভেতরে একটু শিউরে উঠল মনে হল। বাইক চললো হাত নাড়লাম, অনেশ হাত নাড়লো, নাড়ছে, ফ্রিজশট যেন। চিরকাল হাত নাড়বে কি? ভালোবাসবে কি? জানি, তুমি এরপর এসব প্রশ্ন করবে। শিট্, আমি এতশত ভাবি না, তবে জানো তোমার সঙ্গে জীবনের ফিলজফি নিয়ে আলোচনা করতে এত ভালো লাগে, আবার এত বিরক্ত হই এক কথা তুমি বারবার বললে। তো সেদিন চলছে চলছে আর আমার ও রনজয়ের মধ্যে মৃদু ঝগড়াও চলছে। বকুলতলার মোড়ে দেখি তুমি ঝুঁকে ঝুঁকে কোথায় চলেছ। বাইক থামাল রনজয়, আমি বলিনি কিন্তু। তুমি তাকালে, পাণ্ডুর মুখ, যেন হঠাৎ দেখলাম পাতলা হয়ে আসা লালচে চুল, জুলফিও সাদা হতে চললো তোমার। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বাঁ দিকের গালটা ভালো করে সেভ করোনি, সেখানে পাকাদাড়ি খোঁচা খোঁচা ..... ময়লা জামা, ছোঁড়া ব্যাগ, কি যে বুড়ো বুড়ো ছাপোষা লাগল তোমার, আমি ফিক্ করে হেসে হেসে ফেললাম। আমি জানি হাসলে আমায় সুন্দর দেখায়। অথচ তুমি গ্রাহ্য করলে না। মামুলী কথা বললে রনজয়ের সঙ্গে। আমি বুঝলাম রেগে গেছ।

তবু বললাম কবে আসছো?

৭ দিন পর পরের একটা দিন বললে ইচ্ছে করে।

আমি বললাম ওঃ ঐ দিন? ঐদিন আমি নেই। কেন বললাম কে জানে, অথচ ঐদিন থাকবো আমি। কেমন একটা অভিমান হল তোমার ওপর। তুমি বড্ড ব্লান্ট, অভিমানও বোঝে না। তবে কি তোমাকে আমি ভালোবাসি। কে জানে আজ এই মেঘভারগ্রস্ত আকাশের দিকে চেয়ে তোমার কথা মনে পড়ছে কেন? ছাপোষা তুমি, বুড়োটা তুমি ভুলোমনের তুমি আজ আর জোকার হাসাতে পারছো না তোমার বন্ধু গোকুলবাবুর মতো। অবিনাশ, তোমার জন্য কেমন মায়া হচ্ছে, না'কি কণা? কে জানে ভালোবাসা নয়তো? আমি কি সবাইকে একা করে দিই? তুমি বলেছিলে না A,Bকে ভালোবাসে B,Cকে একইভাবে নেভার এনডিং সার্কেল। আমি নীলাব্জর সঙ্গে কথা বললে রনজয় বিষণ্ণ, তোমার সঙ্গে কথা বললে.... এইভাবে সব ঘটছে বুঝেছ? এবার ভেবে দ্যাখো, আমি স্বাধীন নই। তুমি আর আসো নি, আর গেটের শব্দ হয়নি, কুণ্ঠিত গলার ডাকটি শুনিনি। অথচ ঠিক করে রেখেছিলাম যদি আস তাহলে ভালো করে চা খাওয়াবো। গান শোনাবো, ভাল করে কথা বলবো। যাতে নতূন প্রাণ পেয়ে আবার ফিরে যাও। সবাইকেই তো এভাবে প্রাণ দিই আমি, দিই না কি? সবাইকে বাঁচিয়ে রাখি বুঝেছ? তুমি আমার জন্য এত ব্যস্ত হও কেন অবিনাশ? এত উদ্বেগ কেন তোমার? আমি তো রাস্তা ভেবে রাখি। ভেবে রাখি অনেশ বিরক্ত করলে সুমেরুকে দেখিয়ে তাকে তাড়াবো। সুমেরু বিরক্ত করলে বা ওকে ভাল না লাগলে মৃগাঙ্ককে দেখাবো। ব্যাস্ অভিমান ভরে সুমে চলে যাবে, আমি বাঁচবো। এই বার মৃগাঙ্ককে ভাল না লাগলে তোমাকে দেখিয়ে মৃগাঙ্ককে তাড়াবো। আর শেষে তোমাকে তাড়াবো যদি রনজয় ফিরে আসে আমার কাছে। কি বুঝলে? কোল্ড ব্লাডেড্ মার্ডার? হ্যাঁ, একজনকে দেখিয়ে অন্যজনকে তাড়িয়ে আবার একজনকে দেখিয়ে একে তাড়িয়ে আমাকে বাঁচতে হয়। তবু প্রেম থেকে যায় আমার, না' হলে রনজয় রনজয় করি কেন? না'কি নিরাপত্তা? সত্যিই পরপর কদিন বৃষ্টি হয়ে গেল তুমি এলে না সববাই এসেছিল। কত চায়ের কাপের মধ্য দিয়ে বেড়ালাম আমরা, সন্ধ্যাগহন সুপ্তিমগন আকাশে বেড়িয়ে আসা যেন।

জোকার গোকুল ও অধ্যাপক অবিনাশ ঃ

দি গ্রেট রোমান সার্কসের জোকার গোকুল বাবুর তাঁবুবাসার দিকে যেতে যেতে বড় রাস্তায় অবিনাশের দেখা হয়ে গেল

গোকুল বাবুর সঙ্গে। নিতান্ত নিরীহ মানুষ, কথায় পূর্ব বাংলায় টান। ছোট্ট বেঁটে মানুষ, তবে জোকাররা যেমন অস্বাভা বিক বেঁটে হয় তেমন নয়। গোকুলবাবু তবু বেঁটেই, বামন মানুষ যে তা বোঝা যায়। গোকুল নিজেও তা জানে। রাস্তায় বেরিয়ে সে ভয় পায় চ্যাংড়া ছেলেদের। সাধারণ মানুষের চোখে চোখে আর তাকায় মা গোকুল। অমন বিশ্রী কৌতুকের ও সহসা সমবেদনার দৃষ্টি তার ভালো লাগে না। অবিনাশবাবু, স্যারই তাকে সম্মান করে যা একটু বাবু টাবু বলে। তা ব াদে তার পরিচয় গোক্‌লে, গোকুল, পাখিওলা প্রভৃতি। রোমান সার্কাসে সে পাখীওলা সেজে লোক হাসায়। বাইরে গে াকুল সদা বিষণ্ণ। তখন আর কেউ নেই তার। মাঝে মাঝে বুধবার বিকেলের দিকে ঐ অবিনাশবাবু আসেন। যে দিনটা ত ার ছুটি তখন। অবিনাশ বাবুকে দেখলেই তার সেই ফর্সা দিদিমণির কথা মনে পড়ে, ভিক্টোরিয়া দিদিমণি। অবিনাশ বাবুর সঙ্গে এসেছিল তার বাসায়। কি সুন্দর আপনলোকের মত চৌকীতে বসল, কত ভালো করে কথা বলল, এত ফর্সা শিক্ষিত মেয়ের কাছ থেকে এত ভালো ব্যবহার জোকার গোকুল কখনও পায়নি। দিদিমণি এম.এ. পাশ, এখন আরো পড়াশুনা করছে এসব বলেছিল অবিনাশবাবু। আজ দূর থেকে অবিনাশকে একা দেখতে পেয়ে জোকার গোকুল বুঝলো স্যার অ াজ একটু গম্ভীর থাকবেন। দিদিমণি যে দু'দিন এসেছিল যে দুদিন অবিনাশ বাবুকে হাসিখুশী লেগেছিল তার।

ফুটপাথের ওদিকে অবিনাশ, এদিকে জোকার গোকুল দুজনই দুজনের দিকে তাকিয়ে যে কাটল। রাস্তা পেরোতে ভয় পা চ্ছিল দুজনেই ট্রাক আসছে গাঁ গাঁ করে।

সেদিন সারা সন্ধ্যে জোকার গোকুলবাবুর সঙ্গে কেটে গেল অবিনাশের। কি করে যে কাটল। গোকুলবাবুর ছোট্ট দেশল াই বাকসের ঘর, একাকী বিড়ম্বিত জীবনের গল্প শুনে শুনে অবিনাশ কি ভাবতে লাগল আনমনে।

মাঝে মাঝে গোকুল সম্বিত ফিরিয়ে দিচ্ছিল,

শুনছেন নাকি স্যার?

অবিনাশ, 'উঁ'।

---আর খাবেন না অনেক হইছে।

অবিনাশ শেষ রামটুকু খেয়ে গেলাস উল্টে দিয়েছিল। 'আপনার ফ্রীজ নেই গোকুলবাবু? ঠাণ্ডা জল খেতাম একটু।

গোকুল এ শুনে ম্লান হাসল। অনেক কিছুই নেই তার। পুরো মানুষের উচচতাই নেই যা থাকলে সে ফায়ার জাম্পের খেল া দেখাত এম. ঋষিকুমারের মতো। আবার সে পুরোপুরি বামন নয়, তেমন ছোট নয়, ছোট হলে মাইনে বাড়ত তার। তবে সে হাসতে পারে, শুধু অঙ্গভঙ্গী নয়, মজার মজার গল্পও বানাতে পারে স্টেজে। তার গলার স্বর ভারী ও মোটা। সে ঐ গলায় মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেবার ক্যারীকেচার করে রাজনৈতিক নেতাদের অথবা অভিনেতাদের। দি গ্রেট রোমান সার্ক াসে তার শেষ খেলা ''বোকা পখিওলা'' যেখানে যে পাখী বেচতে গিয়ে নানাভাবে নাকাল হয়ে শেষে পাখীগুলোকে উড়িয়ে দেবে আর সে সময় তার মালিক এসে তার কান ধরে তাকে ধোলাই দেবে। সে হাউ হাউ করে নানা বিকৃত মুখভঙ্গী করে কাঁদবে আর তা দেখে হাজার হাজার দর্শক গমগম করে হাসতে থাকবে। বাববা সে কি হাসি! গোকুল জানে ভিক্টোরিয়া দিদিমণিও সেদিন সার্কাস দেখতে এসে সামনে বলে খুব হেসেছিল। এত ফর্সা বলেই কি ভিক্টোরিয়া দিদিমণিকে নজরে পড়েছিল তার? খুব হাসছিলো ভিক্টোরিয়া, পাশে অবিনাশ বাবু স্যার কিন্তু অদ্ভুত থমথমে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। গোকুল মেক আপ মে ফিরে এসে অস্বস্তিবোধ করছিল একবার, সবাই হাসলো স্যার হাসলেন না কেন? ভ ালোওলাগছিলো তর। কেন ভালো লাগছিল অবিনাশ না হাসার কারণে তা সে বুঝতে পারিছিলো না। এই পাখীওলার প্রহসনটা তারই তৈরি, তারই ডিরেকসন। সার্কাসের মালিক বোধহয় এসব অরিজিনালিটির জন্য গোকুলকে একটু অন্য চোখে দ্যাখেন। মাঝে মাঝে প্রহসন পাল্টায় গোকুল, গল্পের দৃশ্য বদলায়। মালিক ভাল বলে, ব্যস ঐ পর্যন্ত মাইনে বাড়ায় না, অথচ গোপাল সার্কাস ছেড়ে যাবে বলতেই তাকে খুব খাতির করলো মালিক। গোকুলের মনে এ নিয়ে দার্শনিক চিন্তা আসে, ডায়েরীতে লিখে রাখে, লেখে ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্নের কথাও। কেন লেখে কে জানে। সার্কাস শেষে সেদিন রাত্রে এক আশর্চ্য স্বপ্নে দেখে মালিক টানছে তার কান ধরে পিঠে কিল পড়ছে, সে বিকৃত মুখভঙ্গী করে কাঁদছে আর হাজার দর্শকের গমগমে হাসি ছাপিয়ে ভিক্টোরিয়া দিদিমণির হাসি তছনছ করে দিচ্ছে সব। সে খুব দুঃখ পাচ্ছিল স্বপ্নে, ভিক্টো রিয়া দিদিমণি তার এই দুর্দশা দেখে হাসছে কেন? কষ্টে তার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল সে বিছানায় উঠে বসে পড়েছিল। তখন ভোর হয়ে আসছে। দূরে সার্কাসের খাঁচায় পোরা এর সিংহের গর্জন ভেসে আসছে। কি হল ওর?

সে রাত্রে আসর ভেঙ্গে সন্ধ্যা গড়িয়েছিল নিশীথরাত্রির দিকে ছুটির সন্ধেটা গোকুল সাধারণত ঘুরে আসে এদিক, ওদিক, নয়তো হারমোনিয়াম নিয়ে বসে। হারমোনিয়ামটি ঝক্‌ঝকে্ নূতন। গোকুলের বড় আদরের। মোটামুটি গান গাইতে পারে গোকুল। আর পারে আয়নায় অসংখ্যবার চুল আঁচড়াতে। এইসব সন্ধ্যায় সে বারবার চুল বিশেষত্ব নেই তার চেহারায়, কারই বা আছে? এ'কথা ভেবেছে গোকুল। হারমোনয়িাম নিয়ে বসলেই মীনাক্ষী আসে। সার্কাসের গ্র্যামার কুইন আছে দু'জন। মীনাক্ষী তাদের একজন। তারও বুধবার সন্ধ্যায় ছুটি। মীনাক্ষী মাদ্রাজী মেয়ে কিন্তু পরিষ্কার বাঙালী হয়ে গেছে। খুব ফর্সা, ভিক্টোরিয়া দিদিমণির মতো, কিন্তু বড় ভোঁতা, রবিঠাকুরের কবিতা না হয় পড়েনি কিন্তু তার মাথায় বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হয়না। খালি চটুল গানের দিকে লক্ষ্য।

গোকুল যখন গায় 'এ মণিহার কিনে দাও না গো'। মেয়েটা গান শুনতে ভালোবাসে বলে আসে, না কি গোকুল অদ্ভুত বলে তার কাছে আসে গোকুল বোঝে না। কোনদিন আবার আসেও না। গোকুল বোঝে সেদিন সে অভিসারে গেছে। তবু মীনাক্ষীই এসে তার ঘরদোর সাজিয়ে দিয়ে যায় একটু। তখন গোকুলের মনে পড়ে পাতলা রোগা চেহারার একটি মেয়ের কথা, তার বউ মৃদুলা। কতোদিন আগে সে মারা গেছে। মাত্র সাতমাস পঁচিশ দিন ঘর করেছিল গোকুলের। সে'ও রবিঠাকুর পড়েনি, বড্ড ভোঁতা মেয়ে ছিল। কিন্তু আশর্চ্য্য সেবা দিতো। মা পাখীর মতো আগলে রাখতে শু করেছিল গোকুলকে। খুব ছোটোবেলায় তাকে বিয়ে করে গোকুল। কৃষ্ণযাত্রার আসরে তখন গোকুল গান গায়। মাঝে ম াঝে ২/৩ উধাও হবার পর ফিরে আসার কয়েকটি রাত্রি মনে পড়ে। মৃদুলা গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতো সে রোগা হয়ে গেছে কিনা।

তুফানগঞ্জে কৃষ্ণযাত্রার গান গেয়ে বাড়ী ফিরে শোনে মৃদুলা নেই, সাপে কামড়েছিল। কলার মান্দাসে করে তার দেহ হরিকাকা ভাসিয়ে দিয়েছে গঙ্গায়। গোকুল শুনেই গঙ্গার দিকে দৌড়েছিল, দুপুরের সে গঙ্গানদী মনে পড়ে। কেউ কোথ াও নেই, দুপুরের রোদে বিশাল গঙ্গা ঝিক্‌মিক্ করেছ। মৃদুলা নেই,

---এখন সে থাকলে বড় ভাল হইত স্যার'। গোকুল বলে, এতক্ষণ নিমগ্ন হয়ে অবিনাশ শুনছিল তার কথা, এবার কথা বললো,

---কি ভালো হত?

----এই এখন সে খুশী হতো আমারে দেখে, কতো মানুষ হাততালি দেয়, কতোক্ষণ কতো মানুষকে মুগ্ধ কইর‍্যা রাখি ম াসে মাসে টাকা পাই।

---ধুস্ ভুল কথা, নয় তোমার বউ তোমাকে জোকার বলে ঘেন্না করতো কিংবা তুমি হয়তো জোকার হতেই না নিজে কেঁদে লোক হাসাতে পারতে এমন করে? যদি ভালোবাসা উড়ে না যেত তোমার জীবন থেকে? বলো বলো জোকার হতে? খেতে না পেয়ে তুমি তো জোকার হওনি। উত্তেজনার নেশায় টলমল করছিলো অবিনাশ। সে আর আপনি টাপনি বলছিল না গোকুলকে।

---গোকুল ব্যস্ত হয়ে উঠছিল 'কি করেন' কি করেন আপনার হার্টের দোষ, রাগেন ক্যান্ আমার কথা ছাড়েন।

অবিনাশ আর কিছু বলে নি, সে মুখ গুঁজে গোকুলের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিল। তার বেদনা ছিলো, সে ভাবছিল স্ত্রীর প্রতি গোকুলের আজো কত প্রেম জমা হয়ে আছে। ঐ সাতমাস পঁচিশ দিনে কি পেয়েছিল গোকুল? গোকুলের মনের, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গী হতে পারেনি মৃদুলা কিন্তু সে বোধহয় সেবা দিয়ে মমতা দিয়ে গোকুলকে জয় করেছিলো। বিচারহীন ভ ালোবাসা? মৃদুলা আলোকপ্রাপ্তা, বুদ্ধিবিভাষিতা হলে কি হতো গোকুল? কি হতো আবার তোমাকে এ্যানলিসিস করে বলতো জোকার, বলতো বিশষত্বহীন, বলতো বুড়োটে, বয়স্ক, বলতো ..... গুনগুন করতে করতে অবিনাশ বুঝছিল সে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলছে গোকুলকে। সে'ও কি গোকুল! ট্রাপিজের তার দুলছে শূন্যে, চড়া আলো, ক্ল্যারিওনেট ব াজছে কোথাও সে অধ্যাপক অবিনাশ, জোকার মানুষ, মাথায় গাধার টুপি, চোখে চোখে শুকিয়ে যাওয়া জলধারার সঙ্গে আরও চোখের দল নামছে, সে কাঁদছে হাউহাউ করে আর সামনের আসনে বসে আছে তার স্ত্রী, তারও নাম মৃদুলা, তার পাশে ভিক্টোরিয়া সেন দুজনেই হাসছে তার কান্না দেখে, গমগম করছে হাসি, আর অন্ধকার গ্যালারী যেন ফুলে ফুলে উঠছে।

---তুমি হাসছো ভিক্টোরিয়া, আমি ভেবেছিলাম....

---হাসবো না'তো কি? এত ভালো জোকার তুমি!

রাত্রির এরিনা ঃ

অবিনাশ ঘুমিয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে, স্বপ্নে মৃদুলা তার স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছিল; সেই কলেজ জীবনের মৃদুলা, হাতে শঙ্খ ঘোষের কবিতার বই। ঝক্‌ঝকে্ বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ কঠিন স্বরে বলছিল ''তোমাকে জোকার হওয়া মানায়ানা''।

---কি হব তাহলে আমি? কিছুই তো পারি না, আচ্ছা তুমি হাসলে কেন মৃদুলা?

---জোকারকে দেখে সবাই হাসে, হাসতে হাসতে জোকার যখন কেঁদে ফ্যালে তখন জোকারের প্রেমিকাও হাসে, জোকারকে সেটা সহ্য করতে হয় বুঝলে?

---স্ত্রী যদি বোঝে জোকার তার স্বামী তাহলেও হাসবে তার দুর্দশায়?

--শোনে, জোকারকে কেউ প্রেমিক বা স্বামী বলে মানতে পারে না। তুমি সত্যিকারের জোকারও হতে পারলে না অবিনাশ, মৃদুলা বোধহয় বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। সে এখনও স্বামীকে ভালোবাসে। সে স্বামীকে নিজের মত করে গড়তে চাইছিল শুধু।

বাস্তবে গোকুলের ভয় বাড়ছিলো; স্যার তো বেহুঁশ, স্যারের বউকে কিভাবে সে খবর পাঠাবে? রাত্রিও বাড়ছে। মীনাক্ষী মুখ বাড়িয়েছিল, সে ফিরছে অভিসার শেষ করেয তার প্রেমিক এখন ফাইটার পি.কুমার। ফেরার পথে সে গোকুলের খবর নেয়; ঘরে ঢুকে এসব দেখে সে হেগে আগুন। গোকুল মদ খাবে বা অন্য মেয়ের প্রতি আকর্ষিত হবে এসব মীনাক্ষী একদম সহ্য করতে পারে না। সে যেন গোকুলের গার্জেন এ'ভাবে কোমরে হাত রেখে বললো,

---কেন এ'সব মাস্টার ফাস্টারের সঙ্গে মেশ। কি করবো এখন? মাতাল নিয়ে কারবার করছো শুনলে যে চাকরী যাবে। বিদেয় করো এটাকে।

গোকুল আমতা অমতা করছিলো। মীনাক্ষী ওড়না ফেলে অবিনাশের মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছিল গজগজ করছিলো খুব। গোকুল দেখছিলো মীনাক্ষীর স্ফীত বুকের একদিকটা অনেকটা দেখা যাচ্ছে, সে আনমনে তাই দেখছিলোয চমকে উঠলো মীনাক্ষী --- তুমিও কি আর সকলের মতো আমার বুকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে? তুমি অসভ্য হবে কেন?

গোকুল বুঝতে পারছিলো না সে কি বলবে, সে'তো মীনাক্ষীকে খানিকটা ভালোবাসা। ভালোবাসলে দেহকে বাসতে নেই না'কি? বাস্তবে কিন্তু সে কিছু বলতে পারলো না, চোখে সরিয়ে নিল।

মুচকে হাসলো মীনাক্ষী, তারপর থমথমে গলায় বললো--রাত্রে খাবে কি? আজ তো নিজেকে ফোটাতে হবে। পারবে? না হয় দিয়ে যাব আমি।'

অবিনাশকে হ্যাঁচকা টান মেরে তুলে মীনাক্ষী চশমা পরালো তারপর বললো 'বাড়ি যান স্যার, আর দেরী করলে বৌ পিটবে।' মুখ ঘৃণায় ভেসে যাচ্ছিল তার। গোকুলকে বললো-'হ্যাঁ করে কি দেখছো? একে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এস তাড়াতাড়ি। আমি ততক্ষণ ঘর গুছোই। প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়েই অবিনাশকে ঘর থেকে বের করে দিল মীনাক্ষী। অবিনাশ চললো হাওয়া আঁকড়াতে আঁকড়াতে। ইদানীং এসব অপমান তার গা-সওয়া। গোকুল দুঃখ পাচ্ছিল, সে জানে মীনাক্ষী নয় এখন ভিক্টোরিয়া দিদিমণি সামলাতে পারতো স্যারকে। বাইরে শিরীষ গাছের নীচে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অবিনাশ ফিরে পাচ্ছিল নিজেকে। সে বুঝেছিল নিজেকে নিয়ে experimentএকটু বেশী করা হয়ে গেছে। তার এবার বাড়ীর কথা মনে পড়ছিল। ভি ক্টোরিয়া তার সঙ্গে কথা বলতে চায়নি সন্ধ্যায়। একরকম অবাঞ্ছিতের মতো সে ওর কাছে থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এখন মীনাক্ষী দিল তাকে শ্রেফ্ তাড়িয়ে। তার খুব একা লাগছিল, গোকুল তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে হঠাৎ বললো,

---গোকুল, এখন যদি তোমার মৃদুলা ফিরে আসে তুমি কাকে বেশী ভালোবাসবে মীনাক্ষী না মৃদুলা?

--জানি না স্যার।

---অবিনাশ আকর্ণ হাসলো অন্ধকারে, বর্ত্তমানটাই সবাই মনে রাখে গোকুল অতীত সবাই ভুলে যায়, মেয়েরাতো যায়ই, বুঝেছ?

গোকুল বুঝছিল স্যার ঠিক হয়ে যাচ্ছেন এবার। সে বললো স্যার রিকসা ডাকি একটা?

অবিনাশ বললে মীনাক্ষীর সঙ্গে খুব মেশামেশি করতে ইচ্ছা হয় না গোকুল, যেমন ধরো এই চুমু টুমু . . .
--হ্যাঁ স্যার করে মাঝে মাঝে, কিন্তু ও আমাকে ভালো মানুষ হিসাবেই দেখতে চায়, বোধহয় আমাকে শ্রদ্ধা করে কিংবা যৌনতাররোধ নাই ওর আমার সম্পর্কে। বেচাল দেখলে ধমক দেয়। তবে ভালও বাসে। আমি তাই ওর কাছে ভালোম ানুষ হইয়া থাকি স্যার। অবিনাশ অবাক হচ্ছিল অর্ধশিক্ষিত গোকুলের মুখে যৌনতার বোধ কথাটা শুনে। আশর্চ্য, জীবন ানন্দ লিখেছিলেন না 'বোবা কালা মিনসে এক অপরূপ বেহালা বাজায়।' গোকুলের মুখে মাঝে মাঝে এত ভাল বাংলা বের হয়।
আর মানীক্ষীই বা কি গোকুলকে সে দেবে না কিছুই শুধু তাকে রেখে দেবে।
ভরাট অন্ধকার আকাশ ছিল মাথার ওপরে, ঘরফেরৎ রিকসা যাচ্ছিল একটা। সহসা লোডশেডিঙে ডুবে গেছে চারপাশ, গোকুল হাত তুলে ডাকলে তাকে। রিকসাওলা দেখা গেল স্যারকে চেনে। ইতস্তত তারা দেখল অবিনাশ, বাঘের চোখের মতো জ্বলজ্বলে সব তারা, রিকসায় পা রেখে সে সহসা মুখ ঘুরিয়ে গোকুলকে বললো
---ভিক্টোরিয়া দিদিমণিকে তোমার কেমন লাগে গোকুল?
গোকুল নিমেষে জবাব দিল "খুব ভালো স্যার" আমি ডাইরীতে ওনার কথা লিখা রাখছি, এত সুন্দর কথা বলেন এত পড় াশুনা, কোন সময় অহংকার নাই।
---ভালোবেসে ফেলেছ না'কি? তাহলে ভুল করেছ কিন্তু।
---জানি স্যার, আমি জোকার মানুষ, জোকার মানুষকে আর কে সত্যি ভালোবাসে স্যার, সবাই মজা পায় বলে ভালোব াসে এই গোকুল মিত্তিরকে।
--চমকে গেল অবিনাশ "তুমিও মিত্র না কি হে"
---হ্যাঁ, স্যার।
---আমিও তাই,
---তবে আর কি, আমরা একই রক্তের মানুষ স্যার, কিন্তু একটা কথা কই, কোন দিন আমার মতো জোকার হইয়া লোক হাসাইবেন না স্যার, বড় কষ্টের জীবন। মন ঠিক রাখাই শক্ত। সত্যকারের জোকার হওয়া বড় কঠিন স্যার।
---ঠিক বলেছো গোকুল, যাও, পরে দেখা হবে।
রিকসা চলতে লাগলো হাওয়ায় হাওয়ায়। বাতাসে বাদের গন্ধ কেউ বাজী ফাটিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। অবিনাশ রিকসায় বিবেকানন্দের মতো দু'হাত আড়াআড়ি বুকের উপর রেখে বসেছিল। আশর্চ্য সে যা বোঝেনি জোকার গোকুল তাও বুঝেছে। তার দুর্বলতার সবদিক পরিষ্কার উদ্ভাসিত হয়ে গেছে সকলের কাছে। সকলে নিজের দুর্বলতা লুকিয়ে রাখে, অ ার সে মেতেছিল নিজের দুর্বলতা সকলের কাছে প্রকাশ করে সরাসরি কৌতুকের চোখে সকলের আচরণ দেখতে। তারা কি করে তা দেখার বাসনা ছিল। আজ যখন তার দুর্বলতার উপর স্বাভাবিক ভাবেই আঘাত দেওয়া আঘাত, রূঢ় আচরণ আর সে কৌতুক করে নিতে পারছে না। হায় এ.কি সমাপন, সে ভাবল। কি করে সে জোকারদের জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখবে?
আজ বাড়িতে মৃদুলা দুশ্চিন্তা করছিল। বড্ড রাত্রি হচ্ছে। বাইরে সে ভীষণ কঠিন কিন্তু আজো সে ভালোবাসে তার খ্যাপ া স্বামীকে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, তার ভেতর দিয়ে অবিনাশ বারান্দায় উঠে এলে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। আজ সে একসঙ্গে খাবে বলে অরেক্ষা করছিল। খাবার টেবিলে বসে মৃদুলা লক্ষ্য করলো অবিনাশ যথারীতি মাথা মোছেনি ভালো করে। আজ সে উঠে তোয়ালে দিয়ে মাথা মোছাতে লাগলো অবিনাশের। নিঃশব্দে শিশুর মতো মৃদুলায় ভারী বুকে মুখ গুঁজে রইল অবিনাশ। মাথা মোছাতে মোছাতে হাসল মৃদু "কি হল? খাবে না?"।
অবিনাশ বসে বসেই দুহাত দিয়ে আরো শক্ত করে জড়িয়ে মৃদুলার বুকে মুখ গুঁজে রইল।
মাথাটাও মুছতে পারে না, এত বাচচা ছেলে।
--'উঁ' অবিনাশ মৃদুলার গায়ে মুখ ঘসছিলো।
---নাক উঁচু করে গন্ধ নিল মৃদুলা, তারপর স্বাভাবিক গলায় বললো তুমি তো মদ খাও না আজ খেলে কেন হঠাৎ?
--মনে খুব দুঃখ।

--কেন? কোথায় ছিলে এতক্ষণ।
---অবিনাশ অম্লানবদনে বলে ফেললো প্রথমে ভিক্টোরিয়ার বাড়ী তারপর রোমান সার্কাসের গোকুল....
অন্য দিন হলে বিস্ফোরণ হত, আজ মৃদুলা সামলে নিচ্ছে সবকিছু।
---কেন যাও ভিক্টোরিয়ার বাড়ী?
--ওকে বোধহয় ভালোবাসি।
---ভালোবাসাটা অপাত্রে দিচ্ছ বলে দুঃখ হয় অবিনাশ। শুধু সেইজন্য বারণ করি তোমাকে, মৃদুলার মুখ কঠিন হয়ে গেল। সে ঘুরে অবিনাশের মুখোমুখি টেবিলে বসলো, তার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য শান্ত।
সে বললো ---"তুমি জানো ভিক্টোরিয়া তোমাকে ভালোবাসে না"।
---বুঝতে পারি না।
---ন্যাকামো রাখো, তুমি জানো ভিক্টোরিয়া তোমাকে ভালোবাসে না।
---জানি।
---তবে কেন যাও ওদের বাড়ী? ও তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে একদিন বুঝেছ?
--স্তব্ধ অবিনাশ চুপ করে বসেছিল। মোমবাতির আলোয় মৃদুলার চশমার কাঁচ ঝক্‌ঝক্‌ করছে সে চুপ করে তার পুরনো সঙ্গিনীকে দেখছিলো এ কোথায় ছিল? জন্মেছিল কোথায়? কিভাবে হয়েছিল? তারপর আজ এসে তার জীবনের ভিতর ফুটে উঠেছে।
---কি হল? ধ্যানীবুদ্ধ হয়ে গেলে যে, খেয়ে নাও মাথা নীচু করে খাচ্ছিল অবিনাশ, মৃদুলা বললো অত সংকুচিত হয়ে খাবার কি আছে? আমি কি বাঘ?
---অবিনাশ হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল মৃদুলার দিকে, বললো আমি ছাড়া তুমি আর কাউকে ভালোবাসো নি?
--- বেসেছিলাম, কিন্তু তোমার মতো অপাত্রে ভালোবাসা দিই নি। ইডিয়াটিক্‌ রোমান্সে আমি বিশ্বাস করি না।
তোমার প্রতি ভিক্‌টোরিয়ার ভালোবাসার কোন শেকড় নেই, কোন বেস্‌ নেই। বেস্‌লেস ভালোবাসা শুধু সময় কাটাতে শেখায় এটা ওকে বুঝিও।
অবিনাশ বললো, "বাববা ওকে এসব বোঝানো যাবে না, যা রাগী!"
মৃদুলা অবাক হয়ে চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। অবিনাশের এই সহজ সরল স্বীকারোক্তিতে সে মজাও পেল বোধহয়।
--- ও, ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলে তাহলে! কেমন রাগী ভিক্টোরিয়া? আমার চেয়েও বেশী? যেন শিশুকে জিজ্ঞেস করছে এইভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে উত্তর না পেয়ে উঠে গেল মৃদুলা। ওপরে মুনাই কাঁদেছে।
মীনাক্ষী বক্‌ছিলো গোকুলকে, 'এ মাস্টারটার সঙ্গে সেই ফর্সা মেয়েছেলেটা আর এসেছিলো?'
--- গোকুল আঘাত পেল "মেয়েছেলে বলছো কেন মীনাক্ষী মহিলা বল"
---ধ্যাৎ তেরী সাধুভাষা ছাড়ো তো। শোনো তুমি ওর সঙ্গে মিশবে না। ঐ মাস্টারটার সঙ্গেও না। মেয়েটা আসার পর থেকে তোমার ঘাড়ে ভূত চেপেছিল দুদিন আমি দেখেছি। আর মাস্টারটা আসলে এত বকবক করো। মাস্টারেরও যত পুরনো কথা আর তোমারও। আমার অত পুরনো কথা ভাল লাগে না। তুমিও পুরনো কথা বলবে না একদম বুঝেছ?
একটু থেমে গোকুলের কাছে সরে এল মীনাক্ষী চোখ নাচিয়ে বললো, কিগো, তোমার ভিক্‌টোরিয়া দিদিমণি কবে আসবে? আর একবার দেখা করে নাও, গান শুনে নাও। আরতো পঁচিশ দিন পরে তাঁবু উঠবে।
---তাঁবু উঠবে? ভাবতে ব্যথা পেল গোকুল এই প্রথম। স্যার, ভিক্‌টোরিয়া এরা হাওয়ার মতো মিলিয়ে যাবে? আর দেখা হবে না? --- কোথায় যাবো জানো মীনাক্ষী?
---জামুপিয়ায় রানীগঞ্জের পাশে। কয়ালাখনির লোক এবার সার্কাস দেখবে।
---এদের সঙ্গে দেখা হবে না আর?
--- তো কি হল? আমি তো আর হারিয়ে যাচ্ছি না আমার সঙ্গে দেখা হবে তোমার। বলতে বলতে মীনাক্ষী সরে গেল গোকুলের গায়ে টুসকি মেরে, অথচ সঙ্গ দিল না তাকে। গোকুলের মাথা ধরে ছিল। যদি মীনাক্ষী মাথা টিপে দিত একটু ভাবল সে। মীনাক্ষী তো থাকবে তবু কোথায় যেন একটা শূণ্যতা টের পেল গোকুল। মীনাক্ষী যদি আর একটু থাকতো অ

াজ। গোকুলের খুব একা লাগলো হঠাৎ। স্যার অধ্যাপক আর সে জোকার তবু কোথায় যেন একটা মিল।
একা লাগছিলো অবিনাশের। সে ভাবছিলো ধুপগুড়ির সেই বৌটির কথা যে অপরূপ রূপে পৃথিবী আলো করে বদ্‌রাগী স্বামী আর বাচচাদের নিয়ে, গবাছুর নিয়ে খেটে খেটে কেমন ঝিস্ততায় জীবন কাটাচ্ছে। রাত্রে জোনাকী জ্বললে সে বনপথ পেরিয়ে তুলসীতলায় নির্বিরোধ প্রদীপ জ্বেলে আসে। সারাদিন খাটে কিন্তু কোন অভিযোগ নেই, গ্লানি নেই, ভারী হাসি মুখ। স্বামীর পিঠে গরম তেল মালিশ করে সর্দ্দি বসলে, সাবান কাচে.... ।এই চৈত্রে শিরীষের গাছ থেকে ুড়ে যাওয়া পাত ার মতো তার রূপ ঝরে যাচ্ছে। জোনাকীর সংগে একটা গোটা দিন ও রাত্রি তাকে দেখেছিল অবিনাশ, দেখে শ্রদ্ধা হয়েছিল। এ'রকম স্যাত্রিফাইস বাংলার অনেক বধূ করে যাচ্ছে কিছু না ভেবে। ভিক্‌টোরিয়া পারতো না এ'সব। মৃদুলাও না। একঅর্থে এরা ভিকটোরিয়াদের থেকে মহান, কত সহনশীল। মৃজদলার থেকেও। ভাবতে ভাবতে ঘুম পাচ্ছিল তার টেবিলে বসেই। মৃদুলার স্বরে চটকা কেটে গেল, সে নেমে এসেছে আবার; সে অবিনাশকে নিয়ে শুতে যাবে। অথচ এখনও আলো জ্বলছে। রাত্রি বাড়ছে।
---হাত ধুতে যাও, শোবে না না কি?

রাত্রির এরিনার ভিতরে এরিনায় অবিনাশ মিত্র ঃ
আমি মৃদুলার সঙ্গে শুয়েছিলাম আজ। তারপর মৃদুলা ঘুমিয়ে পড়েছে। মুনাই ঘুমিয়েছে অনেকক্ষণ। বৃষ্টি সরে গিয়ে আক াশে আবছা চাঁদ, আমার ঘর থেকে দেখা যায়। আমি ভাবছি উপন্যাসটা লিখবো কিভাবে। একদিকে থাকবে গোকুল, সে জোকার সে চার্লি চ্যাপলিনের জীবনী পড়েছে কোনসময়। তাকে কেউ হেনস্থা করলে সে ভাবে চার্লির প্রথম জীবনতো এমন ছিল। চার্লি চ্যাপলিনের জীবনী কে দিল তাকে? গল্প শুনেছে বোধহয়। আজ হঠাৎ রাম্ খেতে গেলাম কেন কে জ ানে। মীনাক্ষী বলে সার্কাসের মেয়েটার হাত কি শক্ত। গোকুলের জীবনের আরও ন্দ্বন্দ্বজ্জুনন্দ্বভ্র নেওয়া দরকার। খুঁটিনা টি লিখবো। সার্কাসের তাঁবু খাটাবার বিবরণ, তাঁবু গোটাবার বিবরণ লিখতে হবে। জানতে হবে। মফঃস্বল শহরে সার্ক াসটা ঢুকে পড়েছিল কিভাবে জানি না। মানুষজন হঠাৎ যেন কার্নিভালের মজায় মেতে উঠেছিল। আমি সার্কাসটা ঢুকছে জানলে দেখতাম কিভাবে সার্কাসের এরিনা গড়ে ওঠে। হঠাৎ একদিন ভিকটোরিয়াদের বাড়ি যাবার পথে দেখি রঙিন পে াষ্টার।
'দি গ্রেট রোমান সার্কাস'
তারপর থেকে মানুষের ভীড়ে এসে বাঘ সিংহের খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে। ছোটপ্যান্ট পরা মেয়েদের দেখতে কি ভীড়! কবে চলে যাচ্ছে সার্কাস জানতে হবে। এরিনা কিভাবে শূণ্য হয় তা জানতে হবে। প্রতাপ নারায়ণ লোকটার মুদ্রাদোষ কি? একদিকে যদি গোকুল একটা চরিত্র হয় তাহলে ভিক্টোরিয়া কি চরিত্রে আসবে? কিভাবে আসবে? আমি নিজেকে এই উপন্যাসে আনবো না। লেখককে তার নিজের জীবন কাহিনীর ভেতর থেকে, ইমোশান্ থেকে বেরিয়ে এসে লিখতে হবে। ইমোশান্ বলতে একটা কথা মনে পড়ল গত বুধবার শ্রীমানী বাগানে একটা নতুন ঝক্‌ঝকে কিন্তু অচেনা বুথে উঠেছিলাম ভিকটোরিয়াকে ফোন করবো বলে। বসে আছি, বসে আছি, রাত বাড়ছে, জিনস পরা একটা মেয়ে দেখতে পাচ্ছি সমানে ফোন করে যাচ্ছে উত্তেজিতভাবে। আমি তার পেছনটা দেখতে পাচ্ছিলাম। কাঁধের কাছে জামা সরে ব্রার কালো স্ট্রাপ দেখা যাচ্ছে আর আশর্চ্য আমি চোখ সরিয়ে নিইনি। বুথের মালিক বললো, 'বসুন না'। বসলুম, হঠাৎ শুনি ভেতরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। কাকে বলছে, "ইটস্ টু মাচ্ রঞ্জন, তুমি এভাবে ডিচ্ করো না। বাড়িতে সবাই জানে সেটা কোন ব্য াপার নয় কিন্তু আমি ওকে ছেড়ে তোমার কাছে এসেছিলাম কেন সেটা মনে কর। প্লিজ, রঞ্জন, ওঃ।" কথা বলতে কেঁদে ভ াসিয়ে দিচ্ছিল মেয়েটা। এটা লোকাল কল। বুথে প্রতিদিন এস.টি.ডি. করা লোকজনের ভীড় বাড়ছিল। বুথ মালিক বিরক্ত হচ্ছিল। বিরক্ত হচ্ছিল সবাই। একটা মারোয়াড়ী ছেলে দরজায় টোকা দিল। মেয়েটা কাঁদছে বলে কার ইমোশান্ নেই। সবাই ব্যস্ত। সবাই চায় নিজেরটা হোক আগে। সত্তর দশকে আমি যখন কিশোর তখন কোন মেয়ে এভাবে কাঁদলে চারপ াশ অন্যরকম সমবেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠতো না কি? ভিকটোরিয়াকে সেদিন আর ফোন করি নি। সেদিন ইতিহাসের কথা, মেয়েদের অবস্থার কথা, পার্টির কথা, গনসংগ্রামের কথা, কাটোয়ায় শহীদ মহাদেব ব্যানার্জির কথা খুব মনে পড়েছিল। অনেকদিন পর মনে হয়েছিল হতাশা কাটিয়ে উঠেছি। লজ্জা লাগছিল এই ভেবে যে আমি যখন দেখছি মেয়েটির ব্রা'রক

ালো ষ্ট্র্যাপ, যে তখন বলছে, "আই উইল বার্ন্ট্ মাইসেলফ টু এ্যাসেস...." মানে কোথাও কেউ তার সত্ত্বাকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল।

আজ এখন ভিকটোরিয়ার কথা মনে পড়ে। ভিকটোরিয়াকে ছোটবেলায় ভালোবেসেছিলাম প্রথম। বলতে পারি নি। বলল াম দশবছর পরে যখন সে অন্যরকম। এখন আর তাকে পাওয়া যায় না অথচ পেতে চাইছি। মৃদুলার কাছে লুকাইনি কিছুই তাই মৃদুলাও অভিমানে গাঢ় কুয়াশায় হারিয়ে যাচ্ছে। জমে উঠেছে সার্কাস। পার্টির যুবনেতা পরিমল ভাবছে আ মি জোকার। চারিপাশের মানুষজন ভাবতে শু করেছে আমি জোকার। আর আমি জোকারদের নিয়ে উপন্যাস লিখবো ঠিক করেছি। ক্রমশঃ বুঝছি জোকার হওয়া খুব শক্ত। আর জোকার না হলে জোকার জীবন নিয়ে কিছু লেখা যায় না। প্রেমে না পড়লে বোঝা যায় না যে এর জন্য কত কঠিন মূল্য দিতে হয় সঠিক প্রেমিককে। চিরদিনের প্রেমিককে। অথচ দেখ ভিকটোরিয়ার কত কিছু ভালোবাসি না আমি। তবু এই লোকহাসানোর মধ্যেও কোথায় সত্য থাকে। ভিকটোরিয়ার ইমে াশান নেই। তার হাতে কাজের লিষ্ট। কোথায় দাঁড়াবো আমি? মাথার যন্ত্রনা হচ্ছে, মনে হচ্ছে এক ট্রাপিজ থেকে অন্য ট্র্যা পিজে দুলেই চলেছি শুধু, ক্লান্তিহীন, 'গুবরে পোকার ক্ষীণ গুমরানি ভাসিছে বাতাসে...."।

শহর জুড়ে কেচ্ছা, অথচ প্রেমের জন্য কোথায় ছুটছি? এইখানে এসে হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প তৈরি করা যায়। হঠ াৎ করে ছেলেটা প্রেমের মোহ ত্যাগ করে শ্রেণীসংগ্রামে নেমে পড়ল। ওঃ খুব জমাটি জীবনমুখী উপন্যাস হতে পারে। কিন্তু তা বানানো হবে না? যেভাবে ভিকটোরয়িা প্রেম বানায়। এই পৃথিবীর গতির ভেতর কালের ভেতর একটি অমোঘ নিয়ম আছে সেই নিয়মেই মানুষ হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। অর্থাৎ চান্সেস এণ্ড প্রবেবলিটি। শেষ পর্যন্ত, একেবারে শেষে ম ানুষ বানিয়ে কিছুই প্রমান করতে পারে না। এরিনা শূন্য হয়েও পরবর্তী খেলার আকর্ষণে কিভাবে সেজে ওঠে তা দেখবো। দেখাবো মেয়েদের কাছে নিরাপত্তাই কেন বড়ো।

কিন্তু উপন্যাস বড় প্লট কি হবে তাহলে? প্রেম আর প্রেম না পাওয়াই কি মূল প্লট? জোকারের জীবন কি গৌন? বোধহয় ন া, আমরা কখনো না কখনো সবাই জোকার, তখনও ভাবি আমরাই মুখ্য। আর উপন্যাসের মূল কথা তো বিচ্ছেদ বেদন া। আকষ্মিক বিচ্ছেদ, রূপান্তর, বারবার তো তাই হয় জীবনে। বেবাক ফাঁকা হয়ে। সবকছি ফাঁকা হয়ে যায় সার্কাসের এরিনা, রাত্রি নেমে আসে। বিবর্ণ হয়ে আসে জলহস্তী ও সিংহের পোষ্টার। এই বিচ্ছেদ বেদনা মানুষের মনকে ধরে রাখে। আর ভাবতে পারছিনা। অনেকদিন পর মৃদুলা পেয়েছিল আমাকে। ঘুমুচ্ছে এখন। আমি ভ্যালিয়ম খেয়েছি ঘুম আসে না বলে। কটা কৃষক বা শ্রমিক ভ্যালিয়ম যায়? লেলিন কি বলেছিলেন শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে? আঃ ভারী হয়ে আসছে মাথা। রামকৃষ্ণ নটী বিনোদিনীকে মা বলেছিলেন। আমি রামকৃষ্ণকেও ভালোবাসি। একেবারে সোসাল ডেমোক্র্যান্ট আর কি। না অন্যভাবে বললে আমি পেটি বুর্জোয়া। আমি বামপন্থী শাসকদলের সমর্থক। বিপ্লবীদের কাহিনী পড়তে ভাল লাগে কিন্তু এখন দেখ ঘুরে ফিরে সেই ভিকটোরিয়া। সেই একই কাহিনী, আমার জীবন কাহিনী, এখান থেকে বেরিয়ে না গেলে মহান উপন্যাস কিভাবে লিখবো? প্রেমে ডুবে যাব না'কি? এদিকে সখ কতো আমার, নিজে সার্কাস নিয়ে জীবনমুখী উপন্যাস লিখতে পারছি না ওদিকে ভিকটোরিয়াকে বলেছি উপন্যাস লেখ তুমি। আচ্ছা বেশ প্রথম পঁচিশ পাতা লিখে দেখাও। ব াংলা তুমিতো খুব ভালো লেখো। কিছুই পারছি না আমি। কাকে খুঁজছি? আজ আর লেখা হবে না, এবার শুয়ে পড়ি। অ ামার ঘর থেকে দেখা যায় রাত্রির আকাশ। কত শতাব্দীর পর শতাব্দী ঐ রাত্রির আকাশে কেটে গেছে। খাঁ খাঁ দুপুরও বড় মায়াময় এই ঘরের জানলা দিয়ে। দেখা যায় গন্ধরাজ লেবু গাছে মৌমাছির চাক ঝুলে আছে। পেয়ারাপাতা বেয়ে হেঁচে যাচ্ছে পিঁপড়েরা....,

আর সত্যিই তখন খাঁ খাঁ দুপুর, এসপ্ল্যানেডের চলন্তিকা ভিড়ের ভেতর অবিনাশ হাঁ করে স্যাকসোফোন বাজানো দেখছিল, যে লোকটা স্যাকসোফোন বাজাচ্ছে সে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এরা এবার একটা গাড়িতে উঠবে। অবিনাশ দেখলো গাড়ির রঙ সাদা। কোথায় যাচ্ছে এরা? সে ভাবলো যে মফস্বঃলের মানুষ, কলকাতায় কম আসে, ভীড় সামল াতে অভ্যস্ত নয়, ফলে প্রায়ই ধাক্কা খাচ্ছিল সে। অবিনাশ খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছিলো স্যাকসোফান বাজিয়ের বুকের দোষ হয়ে যাবে না'তো, যে রকম ফুঁ দিচ্ছে। সে এমন মাঝে মাঝে ভাবে, প্ল্যাটফর্মে ভিখারীর ছোট্ট বাচচা মেয়েটিকে সস্নেহে পঁ াউটি কিনে কিনে দিতে দিতে ভাবে এর ভবিষ্যৎ কে দেখবে? কোন পার্টি? অথচ এসব দেখা বা ভাবার কথা তার ছিল না, সে এসেছিল 'সিম্ফনি' থেকে জীবন মুখী গানের ক্যাসেট কিনতে কেননা সে জীবন মুখী উপন্যাস লিখবে ধ্রুপদী চালে।

জীবনমুখী ব্যাপারটা কি? সবায়ের কাছেই তো এক কিনা তা ভাবতে ভাবতে তার সঙ্গে ধাক্কা লাগল বেঁটে মতন একটা লোকের।

---কি ভাবছো কি, দেখতে পাও না? লোকটা অক্লেশে তুমি বললো।

স্যাকসোফোন বাজিয়ের বুকের দোষ কিনা না ভাবলে হয়তো ধাক্কা লাগতো না। দোষটা টাইপরা লোকটারই। কিন্তু অবিনাশের মনে হল সে-ই অপরাধী বোধহয়। সে বললো, 'না মানে'। তার মনে বিস্ময় হচ্ছিল তাকে কি কুলি মজুরের মত দেখতে? ক্রোধ হচ্ছিল, ঐ লোকটা কি জানে আ-আমি অধ্যাপক। উত্তেজিত সে আর কিছু বলতে পারেনি। যে ধাক্কা ম ারল সে লোকটা বেঁটে, সঙ্গিনীকে দেখতে না পেরে ধাক্কা মেরেছিল, দোষ তারই। সঙ্গিনীকে দেখতে পেয়ে সে 'বনলতা' এই বনলতা' বলে ছিটকে গেল।

বাজে লোক, দক্ষিণপন্থী, জীবনমুখী উপন্যাস একি বুঝবে? বিড়বিড় করছিল অবিনাশ। আবার জীবনমুখী ভিড়ের ধাক্কা খেল সে। জীবনদেবতা বোধহয় মুচকে হাসছিলেন এত সহজেই তার বামপন্থী, হওয়া ও দক্ষিণপন্থী চিহ্নিত করা দেখে। জীবনমুখী ভিড়, গাড়ি, খিস্তি, মানুষের পায়ের আওয়াজে তার কান গম্‌গম্‌ করছিল। জোড়ায় জোড়ায় প্রেমিক প্রেমিকেরা যাচ্ছে। ধাক্কায় তার হতে থেকে ঝরঝর জীবনমুখী গানের ক্যাসেট ঐ যে মেঘের মত সোনালী চুল, অপরূপ ঠোঁঠ, বিষণ্ণ অথচ মদির গভীর চোখ নিয়ে ভিকটোরিয়া, কণ শাঁখের মত বুক নিয়ে ভিক্টোরিয়া এসে তার কোমল মায়াবী হাতের আঙ্গ ুল দিয়ে ভিড় থেকে জীবনমুখী গানের ক্যাসেট গুলি তুলে তুলে তার হাতে দিচ্ছিল জীবনমুখী উপন্যাসে তা ব্যবহৃত হবে ভেবে। এত ভালোবাসায় চোখে জল এসে যাচ্ছিল অবিনাশের।

এরিনায় গোকুল মিত্র দ্য জোকার ঃ

গোকুলের ঘুম আসছিলো না। ঘরে জোনাকী ঢুকে পড়েছে একাটা দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে আঘুনের মতো। খঅলি চেয়ে থ াকতে ইচ্ছে করে। কতো কথা যে মনে পড়ছে, ঠিকই বলেছে মীনাক্ষী, মাস্টার আসলেই যতো পুরনো কথা মনে পড়ে। মৃদুলার কথা মনে পড়া। মীনাক্ষীতো মৃদুলার মতো নয় তবু কোথায় যেন মিল। আর ভিকটোরিয়া দিদিমণি যেন স্বপ্ন একটা, ঠিক সেই মনোরঞ্জন অধিকারীর বোন রমিলার মতো, যে আশর্চ্য সুন্দর যাত্রার গান লিখতো সুর দিতো, গাইতো। ইংরেজীতে কথা বলতো, তাকে গল্পের বই পড়তে দিত। তাকে দেখতে বিশ্রী বলে অবজ্ঞা করতো না। তার লেখা গান শুনতো। তাকেই প্রথম ভালোবেসেছিল গোকুল। ভিকটোরিা দিদিমণির মতো এত সুন্দরী সে ছিল না কিন্তু কোথায় যেন বড়ো মিল।

--- তবে শেষ পর্যন্ত কারে খুঁজতাছি আমি? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো গোকুল। স্বপ্নে দেখল সে জলে পড়ে গিয়ে হঁ াচোড় পাঁচোর করছে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে, হাত পা ছুঁড়ছে। আপ পাড়ে দাঁড়িয়ে ভিকটোরিয়া দিদিমণি আর মনোরঞ্জন অধিকারীর বোন রমিলা খুব হাসছে। তাদের হাতে বই। হঠাৎ গান গাইতে লাগলো তারা --- এ মনিহার আমার নাহি স াজে। গোকুল চ্যাঁচাচ্ছিল বাঁচাও বাঁচাও আর তারা রবিঠাকুরের গান গাইছিলো।

অসমাপ্ত উপন্যাসের এরিণায় ভিক্টোরিয়া সেন ঃ

"".....আর জীবন তো পদ্ম পাতায় জলের মতন জানতাম। সম্পর্কও তাই। তবে কিছুটা সময় লাগে চারপাশে আগুন, জল ও বাতাসের ভেতর দিয়ে সমীকরণে আসতে। অনেক ঝুঁকি থাকে, প্রেমের জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হয় তহে হে বাঙ ালী প্রেমিক, সব ধরনের স্বার্থত্যাগ কি একবিংশ শতাব্দীতে সম্ভব? আমি পারি না, কারণ আমার মনে হয় আমার কথা অ াগে শোনা হল না কেন? আমি একবার এক বিপ্লবী পার্টির বিপ্লবীকে পরীক্ষা করেছিলাম। কমরেড শান্তি ঘোষের দলের ছেলে, বর্ধমানে সে আমাকে নানা সশস্ত্র বিপ্লবী ইস্তাহার দিয়েছিল তার চোখে সমাজ বদলের স্বপ্ন ছিল, সে স্বপ্ন যে কি তা আমি বুঝতে চাইনি, বুঝতে চাইও না, আমি চাই গাড়ি চড়তো। কিন্তু দেখলাম সে'ও মানে ঐ বিপ্লবীও ক্রমশঃ বিপ্লব ভুলে আমার ভালোবাসা পেতে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। আজ ভাবি, পড়বো না তবু ইস্তেহার নিয়েছিলাম তো। বিপ্লবী প্রেমের জন্য কি ভেঙে যায়? চুঃ চুঃ তবে সবাই এমন নয় তাও তো শুনিছ। ঐ ছেলেটাইতো বলেছিল সরোজ দত্ত কিভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন সাজানো বাসরশয্যা। ছেলেটাও নিয়োগীর মত গায়ে হাত দিতে চেয়েছিল শেষপর্যন্ত অথচ বিপ্লবকে সে শ্রদ্ধ

া করতো। তো যাগ্‌গে আজ সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে এই মল্লারপুর, আর আমার অসংখ্যবার মনে পড়ছে যত সমীকরণের অঙ্ক''।

প্রখর রোদের সকালে এই পর্যন্ত লেখার পর ভিকটোরিয়া বুঝল আর লেখা যাবে না। এরপর আর কিছু নিয়ে এগুবার চেষ্টা বৃথা। তার মনে হচ্ছিল অবিনাশদার কথা শুনে শুনে এইভাবে উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়। কি করবো তাহলে আমি? এ'কদিন কি নিয়ে থাকবো? দোতলার এই ঘরে রোদের উত্তাপ। অথচ উপন্যাসে সে লিখছিল বৃষ্টির কথা। মাঝে মাঝে গরম হাওয়া আসছিল নীল আকাশ থেকে। টেবিলে মাথা রেখে সে ক্লান্ত চোখে তাকায়, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের খসড়া হাওয়ায় উড়ে যেতে থাকে। ঐ টেবিলের নীচে গেল, ঐ ঢুকে গেল আলমারীর তলায়, সারারাত এরপর ইঁদুরেরা হেসে কুটি কুটি করে দেবে তার জীবনকাহিনী।

বাস্তবিকই তখন বৃষ্টি হচ্ছিল না বহুদিন। সকাল ১০টায় চারিদিকে প্রখর রোদের মধ্যে উপন্যাসে বৃষ্টির কথা লিখে একধরনের তৃপ্তি পেতে চেষ্টা করেছিল ভিক্টোরিযা। সব শিল্পসৃষ্টি যেভাবে হতে থাকে। সে এত কিছু ভাবে নি, শূন্যচোখে ত াকিয়ে ছিল দূরের আকাশে, প্রখর নীলাভ আকাশ। সে অস্ফুটে বলল 'কি খুঁজছি আমি? কাকে খুঁজছি?' তার চারিদিকে ম ার্চমাস ফুচে উঠছিল। আঁধারমহিষ গর্জ্জন করছিল তার রক্তের ভেতর। সে আবার মাথা রাখলো টেবিলে, ওঃ এত নিজেকেই অস্ফুটে বলেছিল, 'কি যে খুঁজছি! বোধহয় একজন ভাল মানুষ। যে আমাকে আরাম দেবে, শান্তি দেবে, নির াপত্তা দেবে। যে গান ভালোবাসে, বেড়াতে ভালোবাসে, (সে ভাবল তার বিয়ের জন্য পাত্র চাই বিজ্ঞাপন দিতে হলে যে এসব লিখবে) আর তার সঙ্গে প্রচুর সাহস। প্রচুর টাকা। প্রচুর সবকিছু। কিন্তু নয়নে ভালোবাসা আছে। হ্যাণ্ডসাম, ম্য ানলি, 'এম.ডি' হলে ভাল হয়।' সে এবার হেসে ফেললো, 'ধুৎ আমি কেবল নিজের জন্যই ভাবি বোধহয়''। টেবিল থেকে আবার মাথা তুললো সে, সামনে চাঁপা গাছের ডালে দাঁড়কাক বসে আছে দেখে কিছু মনে হল না তার। কত কথা আজ মনে পড়ছিল তার। আসলে তার ভেতর হারানো ও পুরনো প্রেমগুলির জন্য এক অব্যক্ত কষ্ট হচ্ছিল। অবিনাশের কথা বিশেষভাবে মনে পড়েনি তার।

টেবিলে পাথরের বুদ্ধদেব তাকে দেখে এই নৈঃশব্দের ভেতর মৃদু হাসছিলেন, তাঁর ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছিল তবু তিনি পিপ াসা নিবারণের জন্য বলেন নি 'ভিক্টোরিয়া জল দাও'। ক্যালেণ্ডারে উড়ে যাচ্ছিল পাতার পর পাতা। বোঝা যাচ্ছিল বৃষ্টি হবে না এখন। কোথায় সেই শ্যামল সজল আকাশ? ভিক্টোরিয়ার চোখে জল এসে যাচ্ছিল একা। সে সকলের সামনে কঁ াদে না, বাথমে কল খুলে দিয়ে কাঁদে কোনদিন। আজ তাই ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু সে উঠলো, রনজয়ের দেওয়া ক্য ালেণ্ডারটা পড়ে গিয়েছিল সে তুলে পেরেকে ঝুলিয়ে দিল তাকে। কতদিন রনজয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। টেলিফোনের ডায়ালের দিকে চেয়ে রইল সে। আমি এসকেপিষ্ট হবো না ভাবলো সে। এসকেপিজম্‌ থেকে বের হবার জন্য অবশেষে সে ভাবলো না, বেড়াতে যেতে হবে। রনজয় নয় সে ভাবছিল ব্লু বেল ট্রাভেলার্সের ম্যানেজারকে ফোন করবার কথা, যিনি বরফের দেশে বেড়াতে নিয়ে যান। সিকিম্‌ গেলে কেমন হয়? পার্কার কলমটি হতভম্ব হয়ে পড়ছিল টেবিলের ওপর। উপরের পাখার ব্লেডগুলি প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল তার হলোগ্রামে। সূর্যের তাপে উষ্ণ হয়ে উঠছিল কালি। কলম ভেবেছিল ভিক্টোরিয়া আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লিখবে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া এবার এগিয়ে যাচ্ছিল রেকর্ড প্লেয়ারের দিকে। সে গান শুনবে। বেলা হয়ে গরম বেড়ে ওঠায় তার বাহুমূলে ঘাম অস্বস্তির সৃষ্টি করছিল। ঘরের আবহাওয়া দ্ধাসে অপেক্ষা করছিল এবার কি বেজে ওঠে।

এরিনারও দিন শেষ হয়

শহরের মধ্যে দিন কেটে যাচ্ছিল একটি একটি করে। ভারী নাটকীয় সংলাপ রচিত হচ্ছিল শেষ চৈত্রে। ভিক্টোরিয়া সঙ্গে ঝগড়ার পর অবিনাশ কয়েকদিন জেদ করে জ্বর গায়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াল। কলেজ গেল। পার্টি অফিসে আবার দেখা গেল তাকে। আশ্চর্য এই যে একদিন লোডশেডিঙের অন্ধকারে সে ভিক্টোরিয়াদের বাড়িতে গিয়েছিল, তখন জ্বরে টলমল করছে শরীর কেউ বুঝতে পারেনি। ভিক্টোরিয়া নামলই না ওপর থেকে। কিছুক্ষণ পর আবার গেল। ভিক্টোরিয়া এবার নীচে থেকে ওপরে উঠে গেল একটিও কথা না বলে। সে অবাঞ্ছিতের মতো বসল কিছুক্ষণ, চা খেল, মিসেস সেনের সঙ্গে কি কথা বললো সে নিজেই জানে না। ঘরের দেওয়ালে জমে রইল বেদনা। বাইরে প্রথম চৈত্রের আকাশ একই রকম

ছিল। সে চাইছিল ভিক্টোরিয়া একবার কথা বলুক তার সঙ্গে কিন্তু বাস্তবে ভিক্টোরিয়া অন্ধকার মেঘের মতো রহস্যময় স্তব্ধতায় নিজেকে ঢেকে রাখলো। আর কথা বলা হল না, কথা বললে হয়তো এই রকম সংলাপ ফিরে আসতো আবার
--তুমি রেগে গেছ?
---আমি তো রাগী নি।
---এবার কি আমার চলে যাবার পালা?
---ইচ্ছে করলে যেতে পারো।
--জানি। একে একে সবই ত্যাগ করছে আমাকে
--করলে আমি কি করবো বলো?
---উপন্যাস আর লেখা হলো না
---লেখাটা নিজের ইচ্ছা।
---তোমাকে আবার নিয়ে যাবো বলে কথা দিয়েছিলাম গোকুলের কাছে। তুমি গেলে না, তাই আমিও আর সার্কাসের ওদিকে যাইনি। জোকারের জীবন সার্কসের জীবন জানবার ইচ্ছা হলো কিন্তু জানা হলো না। উপন্যাস লেখার ইচ্ছা ত্য াগ করেছি। সৃষ্টির দেবতা ত্যাগ করছে আমায়। উপন্যাসটা কোনদিনই লেখা শেষ হয় না....
---সেটা কি আমার দোষ। লেখাটা নিজের ইচ্ছায় হয়। কে ত্যাগ করলো সে নিল এসব অবান্তর।
---তুমিও কি ত্যাগ করবে?
--কোনদিন আগেও গ্রহন করেছিলাম কি ভেবে দ্যাখো।
---আমি ঠিক কর্ণের মতো, আমার রথের টাকা মাটিতে বসে গেছে। তুলতে সময় দেবে একটু?
---তুমি উঠবে এখন? আমায় এই ঘরে কিছু কাজ আছে। এবার উঠে বাড়ী যাও। আর শোন এবার একটু আসাটা কমিয়ে দাও। আমি খুব ব্যস্ত থাকছি আজকাল। কিছু মনে করো না রনজয়কেও তাই বলছি। খুব ব্যস্ত আমি।
বোবাচোখে তাকিয়ে রইল অবিনাশ। কল্পনায় নয় সে চমকে দেখল সত্যি সত্যি কথাগুলো বলছে ভিক্টোরিয়া। সে এসে দাঁ ড়িয়েছে দরজায় ফ্রেমে, মুখ লৌহকঠিণ। এক অদ্ভুত উদাসীন নিষ্ঠুর চোখে সে তাকিয়ে আছে। ভালোবাসা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলে মানুষ-এভাবে তাকাতে পারে। কিন্তু কেন? সে নিজেকেই ভেতরে ভেতরে প্রশ্ন করলো। তারপর অতিকষ্টে বললো
---তুমি আমাকে চলে যেতে বলছো?
---তাইতো বললাম---
---চিরকালের মতো?
---উফ্ আচ্ছা প্যানপেনে লোক। হ্যাঁ, হলতো।
অবিনাশ বেরিয়ে পড়লো অন্ধকারেই। সে রাত্রেই তার খুব জ্বর এলো আবার। রাত্রে নিজের ছোট ঘরটিতে একা শুয়ে বুঝতে পারছিলো তার মৃত্যুতে পৃথিবীর কোথাও শোকচিহ্ পথ রচিত হবে না।
চৈত্রের একেবারে শেষদিনে সে উঠতে পারলো অবশেষে। অত্যাচারে অত্যাচারে ঝাঁঝরা শরীর নিয়ে অবিনাশ হাঁটতে ল াগল গাজনের মেলার ভীড়ের ভেতর দিয়ে। কতো মানুষের মুখরিত কলরব ছিলো, জিলিপির গন্ধ ছিলো সে এসব লক্ষ্য করছিলো না।
তার লক্ষ্য এখন সার্কাসের তাঁবুর দিকে। গোকুলের সঙ্গে দেখা করে সে উপন্যাস আবার লিখবে। কাঁচের চুড়ির দোক ানের সামনে আসতেই ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। সে চুড়ির দর করছিলো না। দাঁড়িয়েছিল একা, দূরে সন্ধ্যার অ াকাশ।
ভিক্টোরিয়া মাথার চারপাশে জ্যোতির্ময় বলয়ের মতো বেলুন উড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক বেলুনওলা। অবিনাশ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো ভিক্টোরিয়ার দিকে। সে ভাবছিলো যখনই সে ও মেয়েটিকে দেখে একে একে দেখে না, চারপাশের প্রকৃতিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বাস্তবে সে হাসতে চেষ্টা করলো তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো 'তুমি একা'?
---আশ্চর্য এই যে ভিক্টেরিয়া রাগ না করে স্বাভাবিক হাসল। "নাঃ কেউ নেই আমি একা"। তারপর মুখের ভাব কোমল

করে বললো একদিন এসো আমাদের বাড়ি।
অবিনাশ বলতে চাইছিল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে মেলায় ঘুরবে? তুমি কি আমার সঙ্গে মেলায়....' কি ভেবে অবিনাশ চুপ করে গেল, কথা পাল্টে বললো --- তুমি কতক্ষণ একা এভাবে দাঁড়াবে? ভিক্টোরিয়ার রাগ হয়ে গেল হঠাৎ, এ'সব ন্যাকা কথাবার্তা সে একদম সহ্য করতে পারে না। আমি একা দাঁড়াবো আমার ইচ্ছে, এমন নাছোড়বান্দা ঘ্যানঘ্যানে লোক সে দ্যাখেনি। সে কথা খুঁজছিল। অবিনাশকে তাড়াতে পারলে সে এবার বাঁচে। সে কোন উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়েই রইলো। অবিনাশ বললো "কি করবো, আমি চলে যাবো? -- হ্যাঁ যাও, তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে কেন আমার জন্য।" আর ভুলেও সে উচচারণ করলো না আমাদের বাড়ি এসো। তাহলেই কথা বাড়বে।
ভীড় পেরিয়ে যেতে অনেকটা সময় লাগলো অবিনাশের তারপর সার্কসের মাঠে এসে অবিনাশ অবাক। কিছু নেই? বেব াক ফাঁকা মাঠে শেষ চৈত্রের রাত্রি নামছে। সার্কাস চলে গেল কবে? এখানে সেখানে দড়িদড়া, কাগজ, সার্কাস গুটিয়ে নেবার চিহ কিন্তু নেই। অন্ধকারে অবিনাশ বুঝতে পারছিলো না ঠিক কোথায় গোকুলের অবস্থান ছিলো এখানে। ঠিক কে াথায় থাকতো গোকুল। কোথায় সে ভিক্টোরিয়াকে অবশেষে এনে ফেলতে পেরেছিল একজন সত্যিকারের জোকারের ক াছে। যে শুধুই আনন্দ দেয়। যে শুধুই হাসায়, কাঁদায় না একবারও, বিরক্তি ধরায় না। অবিনাশ বুঝছিলো তার এই আশ্র য়টিও গেল, এখানে তার মনোজগত স্বাধীনতা পেত, অন্য ডাইমেনশন পেত যেন গোকুলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। সে খুঁজছিল কোথায় মীনাক্ষী তারে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল। সে খুঁজছিলো তার অপমানিত হবার সেই জ ায়গাটা হৃদয়ে যেন একটা অদ্ভুত শূন্যতার বোধ ছিল।
গোকুল কি তারই প্রতিরূপ ছিলো? জীবন কিছু একটা করতে চাওয়া মানুষ। গোকুলের চলে যাওয়া, মৃদুলার গঞ্জনা, ভিক্টোরিয়ার প্রত্যাখান সব কিছু যেন তাকে ভেঙে দিচছল। তবে শেষ পর্যন্ত কি খুঁজছি আমি? সে ভাবল। গোকুলের সঙ্গে আর দেখা হল না। বাতাসে মিলিয়ে গেল উপন্যাসের সার্কাস। ফেরার মুখে মাঠের শেষে এসে রনজয় ও ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হল। ভিকটোরিয়া এবার সত্যি সত্যি একা ছিল না সঙ্গে রনজয় ছিলো। রনজয় ভারী স্মার্ট ছেলে সে সহজভাবেই বললো "আরে আপনি? আমরা তো এসেছিলাম সার্কাসের জেকারকে দেখব বলে, কে এক গোকুল। আর দেখা হল না। চলে গেছে সার্কাস। চলে যাবার নোটিশতো চোখে পড়েনি। ---হ্যাঁ আমারও দেখা হল না গোকুলের সঙ্গে । অবিনাশ খুব শূন্যতায় অবসাদে পরিপূর্ণ হয়ে কথাটা বললো। ভিক্টোরিয়া লক্ষ্য করছিল তাকে। অথচ তার এখন তাক াতে ইচছা করছিলো না ভিক্টোরিয়ার দিকে। সে ভাবছিলো ভিক্টোরিয়া তাকে সত্যিকথাটা বললো না কেন? বললেই হতো রনজয়ের জন্য সে অপেক্ষা করছে। তাদের ভাব হয়ে গেছে আবার। ভাবতে ভাবতে তার হাসি পেল এসব ছেলেম ানুষী চিন্তা করছে সে।
--- চলুন এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? মাঠটা ঘুরি, বলতে বলতে রনজয় এগোল।
ভিক্টোরিয়া অস্বস্তিবোধ করছিল, সে ভাবেনি অন্ধকারে ভূতের মতো ভেসে উঠবে অবিনাশ তবু সে বললো "শুনেছি জ্বর হয়েছিল, বেশী ঘুরতে হবে না, বাড়ী যাও। পরে একটু ইতস্ততঃ করে বললো একদিন এসো কিন্তু"। তার কণ্ঠস্বর অতি স্বাভ াবিক ছিলো। অবিনাশের মনে পড়ছিলো ভিক্টোরিয়াদের বাড়ী যাবার প্রথম দিনটি, সেদিনই যেম নতূন সার্কাসের খেলা শু। সেই ট্রাপিজের তার দুলছে শূন্যে, চড়া আলো, ক্ল্যারিওনেট বাজছে কোথাও, বাজছে সাইডড্রাম সে অবিনাশ নয়, জোকার মানুষ, মাথায় গাধার টুপি..আশর্চ্য সার্কাসের পটভূমি বদলে যায়, জোকারের ভূমিকায় তো পরিবর্তন হয় না। ঐ সব ভাবতে ভাবতে সে অস্থির হয়ে ব্যাগ হাতড়াচ্ছিল একবার, একবার পকেট থেকে কি সব বার করছিলো, যেন সে প াগল হয়ে গেছে। এবার এতদিন পরে বুঝছিল সে, আসলে ভিকটোরিয়ার এতটুকু উপেক্ষা সহ্য করতে পারে না। ঘৃণার মধ্য দিয়েও সে ভালোবাসতে পেরেছে অবশেষে। উপন্যাসের শেষটা সে পেয়ে গেছে।
--ভিকটোরিয়া বলছিল, কি হল তোমার? এত অস্থির কেন?
---কেন তুমি বুঝতে পারছো না? অদ্ভুত ক্ষ্যাপা চোখে তাকাল অবিনাশ। তার ভেতরে এক আশর্চ্য কষ্ট, তীব্র বিষণ্ণতা ত াকে ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছিল কোথাও। এ' সময় ভিকটোরিয়া যদি একবার হেসে উঠত বা তাকে স্পর্শ করে বলতো, কি হল কি তোমার? কোথায় কষ্ট হচ্ছে বলো? তাহলেই অবিনাশ বোধহয় আবার শান্ত হয়ে যেত কিন্তু বাস্তবে ভিকটোরিয়া বুঝতে পারিছিলো না অবিনাশের অস্থিরতার কারণ। সে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললো "না বুঝতে পারিছ না, বুঝতে চাইও

না”।
অবিনাশের ভেতরে এবার সাম্রাজ্য পতনের শব্দ ছিলো সে প্রায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছিল আমি তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু তুমি আমাকে এত বেশী করে দূরে সরিয়ে .... বলতে বলতে থেমে গেল অবিনাশ। কি আশর্চ্য সে একই কথা বারবার বলে কাঙালের মতো, ভিখারীর মতো কি পেতে চায়? রনজয় কিছুটা এগিয়ে গিয়ে এক চক্কর দিয়ে ফিরে আসতেই - ভিক্টোরিয়া বললো 'চলো চলে যাই'। রনজয় ইতস্তত করছিলো। অবিনাশকে একা ফেলে যেতে সে সঙ্কোচবোধ করছিলো। ভিক্টোরিয়া তাকে তানা দিল ''চলো চলো, উনি ঠিক বাড়ি ফিরে যাবেন।'' অবিনাশ শুনল যেতে যেতে ভিকটোরিয়া বলছে ''রাবিশ, ড়ন্দ্ব ড্রব্দ ন্ধ্রন্তুস্পপ্পন্দ্ব প্পস্তু. লোকটাকে মনে হত ত্রড্রজন্ম্ব এখন দেখছি সাংঘাতিক ভোঁতা। অত্যন্ত ভদ্র রনজয় কি বলতে গেল। ভিকটোরিয়া বললো, রনজয় তুমি একদম পাত্তা দেবে না লোকটাকে। বিয়েতেও বলবার দরকার নেই। তার হাত ছিল রনজয়ের পিঠে। এরপর আর কোন কথা শুনতে পেল না অবিনাশ। ওরা চলে যাচ্ছিল, ওদের মাথার উপর চৈত্রের রাত্রির মায়াবী আকাশ, আকাশের ভিতর কতো তারা, নক্ষত্র, ছায়াপথ, লক্ষ লক্ষ বছরের কতো সংঘর্ষ ও গতির বিচিত্র ইতিহাস। ভিক্টোরিয়াকে দেখা যাচ্ছিল তখনও। ওর মাথার উপর শুত্রগ্রহ। অবিনাশের ছোট বেলায় তার উদাসীন বাবা শুত্রগ্রহ চিনিয়ে দিয়েছিল অবিনাশকে। সেই কথা মনে পড়লো হঠাৎ। ওরা যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। অন্ধকার মাঠে একা অবিনাশ দেখছিলো আকাশে শান্ত উদাসীন সব নক্ষত্রেরা চেয়ে আছে প্রাচীন কালের ঋষিদের মতো। কি এক অমেয় কৌতুকে কত উঁচু থেকে তারা চেয়ে আছে বামন অবিনাশের দিকে। জীবনে প্রেমকে খুঁজতে গিয়েছিলে তুমি? হাঃ হাঃ বশিষ্ঠ অঙ্গিরা, পুলস্ত, ... সপ্তঋষিরা যেন হেসে উঠছিল আকাশে। আকাশ ভরে যাচ্ছিল হাসির শব্দে, অবিনাশের মনে হচ্ছিল সে যেন এতদিনে প্রকৃত জোকার। প্রকৃত জোকারের মতই সে এবার একা। সে ভাবছিলো একজন মানুষের অস্তিত্ব কতো দ্রুত আর একজনের কাছে না হয়ে যায়। কেন আমি আবার প্রেম ভালোবাস এসব খুঁজছি? শেষ পর্যন্ত কাকে খুঁজছি আমি? শেষপর্যন্ত কাকে খুঁজছি আমি? শেষ চৈত্রের অন্ধকারে মাঠে তার গ্ন শরীর ডুবে রইল। মেঘ জমছিল আকাশে। তার বুকে খুব ব্যথা করছিল কিন্তু পৃথিবীর ঘন নিশীথের অন্ধকার তাকে কোন শান্তি দিতে পারছিল না।

এরিনা হারিয়ে যাবার পর ৩১শে চৈত্র রাত্রে ভিক্টোরিয়া সেন

আজ চৈত্রের শেষ রাত্রিতে ডাইরী লিখছি আমি। দেওয়ালে আমার ছায়া পড়েছে। অতিকায় ছায়া। মিস্ ভিকটোরিয়া সেনের ছায়া। এই ছায়ার ভেতর হারিয়ে গেছে অবিনাশ। ওকে বসিয়ে রেখে এলাম আজ সার্কাসমাঠে। রনজয় ফিরে এসেছে। রনজয়ের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে আমার। এবার আমাদের বিয়ে হবে। রনজয় সিমপ্যাথী দেখতে গিয়েছিল আমি ধমক দিতে তবে ঠিক হলো। হায় অবিনাশ মিত্র, অধ্যাপক, হায় কবি! তুমি ঠিক বিংশ শতাব্দীর নববই এর দশকের লোক নও। নাহলে এখনও কর্ণ তোমার আদর্শ হয়? লেখাপড়া জানা লোকের বাস্তবজ্ঞানের অভাব তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার উদাহরণ তুমি। ঝড় উঠলো, বৃষ্টিও হবে মনে হচ্ছে এখনও তুমি মাঠে বোকা হয়ে বসে আছ কি না জানিনা। যা ইমোশনাল। দুশ্চিন্তা হচ্ছে একটু তোমার জন্য কিন্তু আমি তো কর্ণ নই; দুশ্চিন্তা ঝেড়েও ফেলবো একটু পরে। কোথায় তোমার অস্তিত্বের সংকট আমি বুঝতে পেরেছি তিকন্তু কোনদিন তোমাকে বোঝানো যাবে না তা। অন্যকে না বুঝলে নিজেকে না বুঝলে উপন্যাস লিখবে কি করে? আমি তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি এমন আঁকড়ে ধরলে আসায় যে আমার নিজরই ডুবে যাবার জোগাড়। অনবরত আসতে শু করলে বাড়িতে, পাড়ার লোক চেয়ে দেখত একটা বিবাহিত লোককে মেয়েটা খেয়ে ফেলেছে। তুমি গ্রাহ্য করলে না। ফলে তোমার আসা কমাতে বলতে হলো। আর একটুতেই কি অভিমান তোমার। এতো ছেলেমানুষী, একধরণের ন্যাকামি বলেই মনে করি আমি। আমার ক্লান্তি নেই? অবসাদ নেই? সবসময় তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে? ভালব্যবহার করতে হবে? কি ভাবো তুমি? তোমার অধিকারবোধ বাড়ছিলো, তাই ছেঁটেছিলাম তোমার ডানা। বিংশ শতাব্দীর।
এই শতাব্দীতে আবেগ নেই, প্রেম নেই, গতিসূত্র বোঝে না। এখানে অস্তিত্বের সংকট প্রতি পদে। দেখলে তো অবিনাশ একজন মানুষের অস্তিত্ব আরেকজনের কাছে কেমন স্রেফ কিছু না হয়ে যায়। এটা তোমার করলাম। আমার নিজের খুব তৃপ্তি হয় এতে। তুমি স্থির ভাবে ভালোবাসলে হয়তো আমিও শ্রদ্ধা করতাম, তোমায়, কিন্তু তুমি আর পাঁচজনের মতো যেই অস্থির হয়ে পড়লে অমনি তালককেটে গেল। তুমি তো জান মাষ্টারী একেবারে পছন্দ হয় না।

কাল ১লা বৈশাখ, কাল আমার বাড়ী আবার আমার প্রেমিকেরা উপহার নিয়ে আসবে, উফ্ পাগল হয়ে যাই আমি এত প্রেমিক আসে। এত ভালোবাসার জোয়ার আসে। আমি কিন্তু ফেরাইনা, হাসি। প্রেমপ্রেম ভাব দেখাই, চোখ কোমল করে তাকাই, তারপর ভুলে যেতে থাকি। এইভাবেই বিয়ে পর্যন্ত দিন কাটিয়ে দেব আমি। কি খুঁজছি আমি নিজেই জানি না অথচ তুমি কি খুঁজছো আমি জানি।

কাল যথারীতি, রনজয়, সুমে, অর্নিবান অনেশ সবাই আসবে। এরা সবাই আমাকে কে কি বলেছে জানি আমি। রনজয় কতো কঠিন কথা বলেছে। অনেশ বলেছে প্রসটিটিউট। সুমে বলেছে টাকা বোঝে আর অহংকারী, নীলাব্জ বলেছে অতিশৌখীন, নিজেকেই একমাত্র ভালবাসে। মর্ম বোঝে না। অথচ ওরা ভালোবাসতে আসে আবার। আমি হাসি আর চায়ে চামচ ডুবিয়ে চা দিই। কাল সবাই আসবে, এমন কি বুড়ো নিয়োগীও। তুমি আসবে না। জানি বৃষ্টিতে ভিজে আজ হয়তো এখন টলতে টলতে বাড়ী ফিরছো। কাল খুব জ্বরে বিছানায় পড়ে থাকবে। স্বপ্নে দেখবে আমায়। আমি তোমার কাছে স্বপ্নেই, যাবো অবিনাশ। স্বপ্নেই থাকবো তোমার কাছে। দেখা করার দিন শেষ, রনজয় বলেছে মে মাসে বিয়ে করবে আমাকে। তুমি ছোট বেলায় স্বপ্নে যেমন দেখেছিলে আমাকে তেমনই চিরকাল দেখো। আমারও বয়স বাড়ছে সংসার দরকার, আয়নায় নগ্ন আমাকে আমি দেখেছি, সত্যিই সুন্দরী লাগে না। বাইশ বছরের ভিকটোরিয়া যেন কোথায় গেল? আমার চোখের দৃষ্টিতে অভিজ্ঞতা জমছে। ঈষৎ বিবর্ণ খসখসে হয়ে যাচ্ছে চামড়া, আমি তিরিশের দিকে এগিয়ে গেছি অবিনাশ, এই বোধ এক একদিন তাড়া করে আমাকে। অথচ দেখ তোমার স্বপ্নে আমি কি উজ্জ্বল, সেই ছোটবেলায় আমি। তোমার ত্রুটি, তোমার ভেঙে যাওয়া, তোমার সাধারণ হয়ে যাওয়া আমিও সহ্য করতে পারি না অবিনাশ, তাই রেগে যাই তোমার ওপর। হয়তো তোমাকে ভালোবাসতে পারি নি তবু তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আজো চাই তুমি বাঁচো, তুমি স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকো অবিনাশ। তোমার স্বপ্নে চিরকাল সেই ছোটবেলার আমি যেন ফিরে আসি। উপন্যাসটা শেষ করো, একদিন আমিও শেষ করবো। আমি তোমার কাছে স্বপ্নে যাবো, অন্ততঃ লেখবার স্বপ্ন দ্যাখো অবিনাশ। তুমি তখন জ্বরের ভিতর হয়তো দেখবে সমুদ্রে তোমার পাশে আমি দাঁড়িয়ে। জ্বরের ভিতর ভেসে উঠবে বেড়াতে যাবার সে দিনের স্বপ্ন। যেদিন আমি পাশে ছিলাম, ঘুরেছিলাম তোমার সঙ্গে। সার্কাসের এরিনায় সার্কাসেরই এক জোকারের কাণ্ড দেখে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিলাম। জোকারকে দেখে সবাই হাসে। সবাই, এমনকি জোকারের প্রেমিকাও। আর সার্কাসের জোকাররা এত হাস্যকর সত্যের কথা বলে....

(রচনা কাল ১৯৯৭-৯৮)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com